স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৪র্থ বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর২০১৫

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল	❑	ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু	❑	ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার	❑	ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	❑	ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল	❑	ডা. সোহম সরকার
বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা	❑	নিত্য দাস, মনোজ দে, গোপাল সরকার
প্রচ্ছদ	❑	উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন: ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

১. ধর্ষণ কেন? ধর্ষণ প্রসঙ্গে নানা-অজানা কথা নানাভাবে আলোচনা করেছেন: প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়----**রঙ্গন ভালোবেসে** (১১) ;
রুমঝুম ভট্টাচার্য----**কেন ধর্ষণ? এক সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ** (১২) ;
ডা. অবন্তিকা পাল—**নারী ধর্ষণ সম্পর্কে দু-চার কথা যা আমরা জানি অথবা জানি না** (১৫);
মিতালী—**অজস্র অরুণার মৃত্যুর পরেও নির্ভয়া** (২১)

২. ডা. গৌতম মিস্ত্রী
স্নেহময় লিভারের ভার: ফ্যাটি লিভারের কথা
বিশদে নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়—ফ্যাটি লিভার কী? কেন হয়? লিভারের এই বাড়তি চর্বির ভাঁড়ার মেটাবোলিক সিনড্রোমের অংশ হতে পারে এবং তা থেকে হৃদরোগ, স্ট্রোক হতে পারে। ফ্যাটি লিভারে ওষুধ প্রয়োগ নিরর্থক ইত্যাদি (৫)

৩. ডা. সৌম্যকান্তি বাগ
কিডনির পাথর—দু-চার কথা
কিডনিতে পাথর কেন হয়? কীভাবে হয়? কোন খাবার খেলে বা কী কী রোগে পাথর হতে পারে; এ-রোগের চিকিৎসা কী—এসব নিয়ে সহজভাবে আলোচনা (৯)

৪. ডা. জিৎ সরকার
কত ভূমি কাঁপলে তবে মানুষ বদলাবে
নেপালের ভূমিকম্পে ত্রাণকাজে গিয়ে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহজ ও আন্তরিক মানবিক বিবরণ (৪৭)

৫. প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
এক হৃদ্‌রোগীর গপ্‌পো
হৃদ্‌রোগী লেখকের রোগের সঙ্গে টক্‌কর দিয়ে টিকে থাকার কাহিনি (৩৭)

সূচি

সম্পাদকীয় ৩

স্নেহময় লিভারের ভার: ফ্যাটি লিভারের কথা ৫
ডা. গৌতম মিস্ত্রী

কিডনির পাথর—দু-চার কথা ৯
ডা. সৌমকান্তি বাগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে: মেয়েদের ভুবন

রঙ্গন ভালোবেসে ১১
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

কেন ধর্ষণ? এক সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ১২
রুমঝুম ভট্টাচার্য

নারী-ধর্ষণ সম্পর্কে দু-চার কথা যা আমরা জানি অথবা জানি না ১৫
ডা. অবন্তিকা পাল

অজস্র অরুণার মৃত্যুর পরেও নির্ভয়া ২১
মিতালী

স্মরণে **মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে যেমন দেখেছি** ২৫
রবীন চক্রবর্তী

টুকরো খবর একই পরীক্ষায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে চার্জের হেরফের ২৭

শরীর নিয়ে মিথ বা লোককথা ২৮
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

হরেকরকম: স্বপ্নদোষ ৩০

পথ দুর্ঘটনা হাড় ভাঙা ও প্রবল রক্ত ক্ষরণ এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ৩১
ডা. অর্ক বৈরাগ্য

চেনা ওষুধ অজানা কথা এলবেন্ডাজোল ৩৪

আপ্যায়নেই না, শরীর সুস্থ রাখতেও চা খান ৩৫
অনন্যা মন্ডল

এক হৃদরোগীর গপ্‌পো ৩৭
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

টুকরো খবর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার বিড়ম্বনা ৪৫

হরেকরকম: করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম কি করতেই হবে ৪৬
চর্মরোগ মানে লিভার খারাপ ৪৬

কত ভূমি কাঁপলে তবে মানুষ বদলাবে? ৪৭
ডা. জিৎ সরকার

হরেকরকম: ঘামাচি কমে কীসে? ৫০
'ভাতুরি' হলে ভাত বন্ধ ৫০
একজিমা সারালে হাঁপানি ৫০

কেন্টকে সার্টিফিকেট ও আইএমএ-র কাছে ডাক্তারদের কৈফিয়ত দাবি ৫১

হরেকরকম: কঙ্কাল কাণ্ডের কঙ্কাল ৫৩
হাই-হিল জুতোর ফ্যাশন ও কান-মলা ৫৪
টিপ, সিঁদুর, সিঁদুরটিপ ৫৪
বাচ্চার কোমরে ঘুনসি ৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

পাতিরাম, ❑ বুকমার্ক, ❑ পিপলস বুক সোসাইটি, ❑ বই-চিত্র, ❑ মনীষা গ্রন্থালয়, ❑ নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), ❑ এস কে বুকস (উল্টোডাঙা), ❑ শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ❑ লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭, ❑ কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়), ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি, ❑ ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ), ❑ বইকল্প (ঢাকুরিয়া), ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১), ❑ জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮), ❑ প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯), ❑ মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪), ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২), ❑ আনন্দম—বরুণ সাহা, ৯৮৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২ ❑ সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪), ❑ শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:

৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

পুরুষ-সমাজ, রাষ্ট্র-এর ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ—ধর্ষণ

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ও নারী'—পুরুষ-সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই নারী ভোগ্যা। পুরুষকে সবদিক থেকে তৃপ্ত করাই নারীর জীবনের চরম লক্ষ্য। সেকারণেই ক্ষমতাবান পুরুষ যখন-তখন যাঁকে-তাঁকে, যেকোনো নারীকেই তার ইচ্ছাখুশিমতো ভোগ করতে পারত। বলবার কিছু ছিল না। কেননা, সামাজিক রীতি তখন এরকমটাই ছিল। ধর্ষণ কথাটার চল ছিল কি না কে জানে! মুনিঋষিরা (যদিও তাঁরা ব্রহ্মচারী), রাজাগজারা যেমন খুশি প্রকৃতিপুঞ্জ থেকে নারীকে তুলে এনে যৌনলালসা চরিতার্থ করতেন। ধন্য হয়ে যেত সেই নারীর জীবন!

দিনকাল পালটেছে। মানুষ নাকি এখন অনেক সভ্য মার্জিত হয়ে উঠেছে। যদিও পুরুষ-প্রধান সমাজ এখনও নারীর সর্বসত্তার উপর চেপে বসে তবুও অন্তত কাগজেকলমে নারীকে আর 'ভোগ্যবস্তু' বলে মনে করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে? হাজার হাজার বছর ধরে পুষ্ট পুরুষ-সংস্কৃতির কুৎসিত মুখটা কি এখনও তথাকথিত 'সভ্য পুরুষের' মুখোশ খুলে যখন-তখন যত্র-তত্র বেরিয়ে পড়ে না!

পুরুষপ্রধান সমাজে ধর্ষণ ছিল, আছে, থাকবে। কেননা মানসিক বিকারগ্রস্ত পুরুষ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবে যে নিজেই যৌন নির্যাতনের শিকার) ধর্ষণ করবে। ঘরে ঘরে পুরুষ তার স্বামীত্ব জাহির করার জন্য নিজের স্ত্রীকেই ধর্ষণ করে যাবে। সুযোগ পেলে পরিবারের অন্যান্য নারীদেরও রেহাই দেবে না। সমাজকর্তারা তাদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য ধর্ষণ করবে। যাদের মধ্যে কানকাটা ঘোঁতন থেকে, মাননীয় শিক্ষক, মন্ত্রী, সান্ত্রী আমলা—সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—অপেক্ষায়।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পেটোয়া বাহিনীকে দিয়ে অসংখ্য ধর্ষণ (ছোটো ছোটো ঘটনা) করাবে। রাষ্ট্র তার জনদমনবাহিনী পুলিশ-মিলিটারিকে দিয়ে যথেচ্ছ ধর্ষণ করাবে—তার ক্ষমতার ধ্বজাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরার জন্য। কেননা একবার ধর্ষণ করতে পারলেই এবং তা প্রকাশ্যে আসলে ধর্ষিত নারীর ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে। সে পরিবার-সমাজবিচ্যুত হয়ে নিঃসঙ্গ, নচেৎ পুরুষের ভোগে উৎসর্গীকৃত জীবনযাপনে বাধ্য। নারীর মনে একবার ধর্ষণ-সন্ত্রাস চারিয়ে দিতে পারলে আর পায় কে! ক্ষমতার রথ তরতরিয়ে এগিয়ে চলবে।

ইদানিং কিছু নারী এবং তাদের অনুগত কিছু 'ভেড়ুয়া পুরুষ' ধর্ষণ নিয়ে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি করছেন। তাদের জন্য দাওয়াই 'গণধর্ষণ' এবং ধর্ষণের পরে ধর্ষিতাকে খুন—এবার কে যাবে থানায়, কোর্টে ধর্ষণের প্রতিবাদ করতে? হ্যাঁ, খুনের মামলা চলতে পারে, চলুক না—ক-টা খুনি ধরা পড়ে? সেকারণেই অরুণা শানবাগ বিয়াল্লিশ বছর 'পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট'-এ থেকে নিঃশব্দে প্রয়াত হন। তাঁর ধর্ষকের 'ধর্ষণ-জনিত কারণে' কোনো সাজা হয় না। কেননা ১৯৭৩-এর আইনে 'পায়ু-সঙ্গম' ধর্ষণের আওতায় পড়ত না। অরুণার ধর্ষক সোহনলাল এখন মুক্ত দুনিয়ায় অবাধে বিচরণ করতে পারে। রাষ্ট্র মহানুভব!

'নির্ভয়া'কে ধর্ষণ করে রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করে, কামদুনির কিশোরীকে ধর্ষণের পর ধর্ষকরা তাঁকে জরাসন্ধের মতো দু-পা ধরে টেনে চিরে মেরে ফেলে তাদের পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখায়। রাষ্ট্রকর্তারা (এদের মধ্যে কত্রীও আছেন) এইসব ধর্ষকদের অভয়দাতা। তাঁদের বিভিন্ন মন্তব্যে, মতামতে ধর্ষকরা বুকে আরও জোর পায়—পরবর্তী জোরদার হামলার প্রস্তুতিতে।

এ তো গেল ধর্ষকের দিক। আর ধর্ষিতর দিকে? যারা নারী এবং সমাজকে প্রায় অবাধে ধর্ষণ করে চলেছে—তাদের মোকাবিলায় কতটুকু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া গেছে বা নেওয়ার আন্তরিক চেষ্টায় আমরা তৎপর হয়ে উঠতে পারছি? ধর্ষণের বিরুদ্ধে পুরুষের 'মানসিক গড়নে' বদল না আনতে পারলে, গণ-প্রতিরোধের রাস্তায় না নামতে পারলে—আমাদের কেবল দু-একটা ঘটনায় বিচলিত কলমের ডগা থেকেই আগুন ঝরবে, আবার নিভেও যাবে কিছুদিন বাদে। ধর্ষিত নারী এবং সমাজ কবে তাদের পূর্ণ সত্তায় বিকশিত হতে পারবে—সেই আশায় আশায় কাল কাটাবে শবরীর প্রতীক্ষায়।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

স্নেহময় লিভারের ভার: ফ্যাটি লিভারের কথা

বেশি মদ্যপান বা হেপাটাইটিস ভাইরাস সংক্রমণ ও আরও কয়েকটা বিরল রোগ ছেড়ে দিলে, ফ্যাটি লিভার আসলে বাড়তি চর্বির ভাঁড়ার, যা থেকে অনেক সময় লিভারের গুরুতর অসুখ হতে পারে। কিন্তু যে কথাটা তেমন প্রচারিত নয়, তা হল এই যে ফ্যাটি লিভার মেটাবলিক সিনড্রোমের একটা অংশ হতে পারে—আর মেটাবলিক সিনড্রোম থেকে প্রাণঘাতী হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ইতাদি হওয়া সম্ভব। ফ্যাটি লিভারে ওষুধ কোনো কাজের নয়—দরকার সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও অ্যারোবিক ব্যায়াম করে সেইসব মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা দূর করা—লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

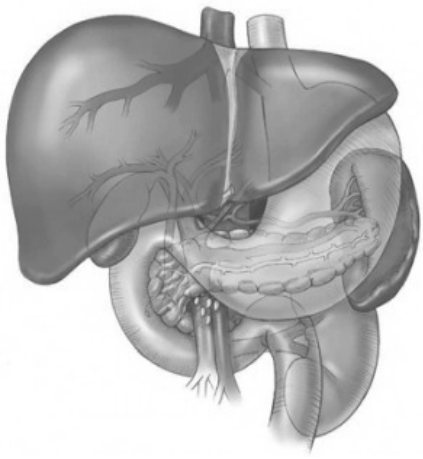

চিত্র ১. সুস্থ লিভার

সেই গল্পের কথা মনে আছে----একটা জাম গাছে মিষ্টি মিষ্টি জাম হত আর সেই গাছে এক বানর থাকত। বানরের বন্ধু ছিল জামগাছের তলা দিয়ে বয়ে চলা নদীর এক কুমির। সেই বোকা কুমির ভুলিয়ে-ভালিয়ে বানরকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে তার বউয়ের ফলার বানানোর জন্য। মিষ্টি জাম খাওয়া বানরের মেটে অর্থাৎ লিভার আরও মিষ্টি বলে কুমিরের বউয়ের আবদার, বানরের লিভার তার চাই-ই চাই। লিভার বা মেটে কুমিরের কাছে কতটা লোভনীয় জানি না, কিন্তু মানুষের কাছে সেটা ভারি লোভনীয়। পাঁঠার মাংসের দোকানে আর একটু বেশি 'মেটে' বা লিভারের অংশের জন্য আবেদন-নিবেদন জানানোর সময় মনে হতেই পারে, পাঁঠার লিভারটা আরও একটু বড়ো হলে বেশ হত।

পাঁঠার লিভারের শ্রীবৃদ্ধি না হলেও আমাদের লিভার গোপনে বেড়েই চলেছে। মনে করুন পেটের অন্য রোগের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নামক ডাক্তারি পরীক্ষা করতে গেছেন। কেঁচো খুড়তে সাপ বেড়োনোর মতো দেখা গেল লিভার বড়ো হয়ে গেছে, অর্থাৎ লিভারে চর্বি জমেছে। এটা ভালো না মন্দ এই ধন্দে যখন আপনি দিশেহারা, চশমার ফাঁক দিয়ে গুরুগম্ভীর ডাক্তারবাবু জানালেন, ''ফ্যাটি লিভার''! আপনি বিব্রত গ্যাসের জ্বালায়, উপর থেকে এই লিভারের ভার। এবার আর পাড়ার ডাক্তারের কর্ম নয়, গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজিস্ট খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেলেন কর্পোরেট হাসপাতালের আউটডোরে। কুণ্ডলি পাকানো পৌষ্টিক নালির হাঁড়ির খবর নিতে ওটার দুই প্রান্ত দিয়ে পাকানো নল ঢুকে গেল গোয়েন্দাগিরিতে (upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy)। এই রিপোর্টগুলো কখনো স্বাভাবিক হয় না! অস্পষ্ট মতামত দিতে ডাক্তারদের জুড়ি নেই। পাকস্থলীর নীচের দিকে হালকা রক্তিম ভাব দেখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার লিখে দিলেন ''এন্ট্রাল ইরোসন (antral erosion)''। এটা অল্পের উপর দিয়ে পার পাওয়া গেল। ফ্যাটি লিভারের ব্যাপারটা আসলে লঘু, কিন্তু বলার কায়দায় গুরু থেকে গুরুতর হয়ে গেল। এটা দরকার ছিল, কারণ লিভারের চর্বির বোঝা কমানোর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ নেই। যে রোগের কোনো সত্যি-ওষুধ হয় না, তার হাজারটা দামি দামি অকেজো ওষুধ থাকে। গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ পেড়ে ফেলার আগে একটা সত্যি কথা সোজাসুজি বলে নেই, ফ্যাটি লিভারের কোনো ''ম্যাজিক পোসন (magic potion)'' বা ওষুধ নেই; আবিষ্কারের সম্ভাবনাও নেই। তাই মনোযোগ দিয়ে জেনে নিতে হবে, লিভারের চর্বি জমার সাতকাহন এবং এই বিষয়গুলো আপনার কোন স্বার্থে আঘাত করছে। কীভাবে প্রতিরোধ করবেন লিভারের এই 'বাড়বাড়ন্ত'।

ফ্যাটি লিভার কী?

ফ্যাটি লিভার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আসল রোগের সঙ্গে ফাউ। এটার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকেন না। সঠিক তথ্য হাতের কাছে না পাওয়ার জন্য, এই ফাউটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন যে কেউ। কিন্তু সঠিক পরামর্শের বড়োই অভাব। বিজ্ঞানসম্মত কোনো ওষুধের অভাবে এই শূন্যস্থান অধিকার করে আছে হরেক রকমের লিভারের টনিক, ক্যাপস্যুল, আর সর্বোপরি অ্যালোপ্যাথি ওষুধের মুখোশের আড়ালে অকাজের নামি দামি অবৈজ্ঞানিক ওষুধ। বিভ্রান্তি বাড়াতে বিভিন্ন সেলিব্রিটিরা অর্থের বিনিময়ে নিখুঁতভাবে ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে টেলিভিশনে লিভার-ভার লাঘব করার আর কোষ্ঠকাঠিন্য (লিভারের রোগের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য কার্যকারণ দ্বারা যুক্ত নয়) দূর করার নিদান দেন, আর অবৈজ্ঞানিক ওষুধ কোম্পানিগুলো পকেটের পয়সা খরচ করে সেগুলোকে জনস্বার্থে (!) প্রচার করে থাকেন। লিভারের চর্বির বোঝা কমাতে এই সব ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই। ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা হিসাবে এই সব বুজরুকি ওষুধের অসারতার প্রসঙ্গ আপাতত অন্য সময়ের জন্য তুলে রাখি। লিভারে চর্বি জমার কারণ, ক্ষতি ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা এবারের আলোচ্য বিষয়।

চিত্র ২. ফ্যাটি লিভার

নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিস (NAFLD)

লিভারে তার নিজস্ব ওজনের ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি পরিমাণে ফ্যাট থাকলে ফ্যাটি লিভারের তকমা আঁটা যাবে। লিভারের অস্বাস্থ্যকর চর্বির উপস্থিতি নির্ণয়ের ও তার মাত্রা নিরূপণের প্রথাগত পদ্ধতি আছে।

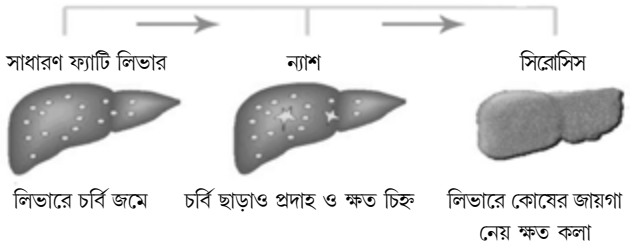

চিত্র ৩. নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিস

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় এর আভাস মেলে। উন্নত পরীক্ষা হিসাবে প্রোটন ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স স্পেক্ট্রোস্কোপি (H-MRS) করে এর পরিমাণগত মূল্যায়ন করা সম্ভব। লিভারে চর্বি জমার হরেক রকমের কারণ হয়, যার মধ্যে কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি কারণ জানা গেছে। জানা আছে, ''বি'' ও ''সি'' দলভুক্ত ভাইরাস সংক্রমণের (ভাইরাল হেপাটাইস) বিলম্বিত কুফল হিসাবে, হরেকরকম জানা বা অজানা লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর বিষ (টক্সিন) ও ওষুধের প্রভাবে, বা অস্বাস্থ্যকর মাত্রার মদ্যপানে (দৈনিক ২০ গ্রামের বেশি) কারণে লিভারে চর্বি জমা হয়। এ ছাড়াও বিরল, ভ্রান্ত জেনেটিক নির্ণায়কের কারণে সৃষ্ট ''অটোইমিউন রোগ'' (elevated antinuclear and anti-smooth muscle antibodies) ও ''উইলসন ডিজিস'' (বিটালাইপোপ্রোটিন কম থাকার রোগ)-এও লিভারে চর্বি জমা হয়। এই কয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিলে পরে থাকে আরও বিশাল সংখ্যক চর্বিসমৃদ্ধ লিভারের রোগ। অশ্রেণিভুক্ত ও বেশি সংখ্যার এইসব ফ্যাটি লিভারের গালভরা নাম—''নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিস (NAFLD) এবং এটি কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মূল্যবান নিউজপ্রিন্ট সাশ্রয়ের জন্য একে আমরা সংক্ষেপে কেবল ''ফ্যাটি লিভার'' বলে উল্লেখ করব। প্রথম প্রথম ফ্যাটি লিভার কোনো কষ্টের উদ্রেক না করলেও ক্রমে এই বাড়তি ফ্যাটের ভাঁড়ার কেবল নিষ্ক্রিয় হয়ে শোভা বাড়ায় না, একটি অত্যন্ত সক্রিয় হরমোন সৃষ্টিকারী এন্ডোক্রিন অঙ্গও (অর্থাৎ, যে অঙ্গ হরমোন তৈরি করে) হয়ে দাঁড়ায়।

নন অ্যালকোহলিক স্টিয়্যাটোহেপাটাইস বা 'ন্যাশ''

ফ্যাটি লিভার প্রথমের দিকে কেবল দৃশ্যমান ফ্যাট-সম্পৃক্ত লিভারের রোগের (macrovesicular steatosis) একটা পর্যায়ে থাকে, যেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমে বেড়ে গিয়ে প্রদাহ (inflammation) সৃষ্টিকারী এক অন্য মাত্রার রোগে ভোল বদল করে ফেলে (nonalcoholic steatohepatitis, বা NASH)। অর্থাৎ প্রথমে কেবল প্রদাহবিহীন ফ্যাটের আধিক্য থাকে, পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রদাহ সৃষ্টিকারী ''নন অ্যালকোহলিক স্টিয়্যাটোহেপাটাইটিস'' বা ''ন্যাশ'' হলে তা বৃহত্তর ক্ষতির কারণ হয়। শেষোক্ত ধরনের ফ্যাটি লিভারের রোগ অন্তিম ক্ষতি হিসাবে ''সিরোসিস'-এ পরিণত হবার ক্ষমতা রাখে। ন্যাশ-এর উপস্থিতি কেবল লিভার বায়োপসির মাধ্যমেই নিরূপণ করা সম্ভব। রক্তে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ নামে এক লিভার নিঃসৃত উৎসেচকের (Alanine amino transferase, ALT, বা অন্য নাম—serum glutamic pyruvic transaminase, বা SGPT) আধিক্য লিভারের ফ্যাটের পরিমাণের আভাস দেয়। মোটামুটিভাবে রক্তে অধিক পরিমাণের SGPT লিভারে বেশি পরিমাণের চর্বির অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

চিত্র ৪. ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস

গুটিকয়েক উল্লিখিত কারণ ছাড়া, ফ্যাটি লিভার মূলত স্থূলতার এক অভিশাপ। যদিও রোগা মানুষেরও লিভারে চর্বি জমতে পারে, তবে সেটা তুলনামূলকভাবে কম। অ্যালকোহল বা অন্যান্য কারণ ছাড়া লিভারে চর্বি জমার সঙ্গে ''ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'' বা ''ইনসুলিন হরমোনে কম সংবেদনশীলতার'' প্রত্যক্ষ যোগ আছে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আবার মেটাবোলিক সিন্ড্রোম (পরে আলোচ্য) নামে এক বৃহত্তর রোগসমষ্টির সূচনা করে দেয়। আমাদের মাঝবয়স থেকে রক্তে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি যত অনিরাময়যোগ্য রোগসমূহ শুরু হয়, তার এক প্রাথমিক কারণ—ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। লিভারে চর্বি জমে গেলে, এরপর খেটেখুটে রোগা হয়ে গেলেও ফ্যাটি লিভার অথবা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স পিছু ছাড়ে না। প্রথমে পেটের রোগ হিসাবে শুরু হলেও ফ্যাটি লিভার পরবর্তীকালে হৃদ্‌রোগে তার পূর্ণতা পায়।

ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে, আমাদের খাবারের রাসায়নিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ লিভারে কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তখন একই পরিমাণের শর্করা জাতীয় খাবার থেকে লিভারে আনুপাতিক হারে বেশি গ্লুকোজ তৈরি হয়ে সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজের বোঝা ইনসুলিনের কর্মক্ষমতার অভাবে রক্তে প্রবাহিত হতে থাকে, অর্থাৎ ক্রমশ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। ইনসুলিন হরমোনে কম সংবেদনশীলতা কেবল রক্তে চিনির মাত্রাই বাড়ায় না, কোলেস্টেরলের কাঁচামাল হিসাবে ''ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের'' মাত্রাও বাড়ায়। ফলে হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য ''সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীর'' রোগ বা এথেরো-স্ক্লেরোটিক রোগ সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মাঝ বয়সের পরে আমরা যে প্রাণনাশক রোগসমূহে (হৃদ্‌রোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক) আক্রান্ত হই, তার যাত্রা শুরু হয় কৈশোরে। প্রথম পর্যায়ে লিভারসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে চর্বি জমে যাওয়ায় তার আভাস মেলে। এই অতিরিক্ত চর্বি কেবল পুরানো জামা টাইট করে না, এটি একটি অত্যন্ত সক্রিয় হরমোন (লেপটিন, leptin) প্রস্তুতকারী অঙ্গও। ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা হ্রাস (ও ডায়াবেটিসের বিপদঘণ্টি) আর অতিরিক্ত ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড (ও লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির) দ্বারা ফ্যাটি লিভার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। উচ্চ রক্ত চাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল হল এর পরের পর্যায়, ফ্যাটি লিভারের

রোগের অগ্রগতির পরের মাইলস্টোন। ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে এথেরোস্ক্লেরোসিস প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সরবরাহকারী রক্তনালীর মধ্যে কোলেস্টেরল ও রক্তে দ্রবীভূত ও ভাসমান বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক জমা হতে থাকে। ফলে রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ দেওয়ালের ঝিল্লি-আবরণ (endothelium) ও মাংসপেশির আবরণটি পাকাপাকিভাবে মোটা হয়ে যায়। মোদ্দা কথা এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক শেকড়বাকড়সহ রক্তনালীর দেওয়ালে এমনভাবে জমে যায় যে মানুষের জানা কোনো উপায়ে সেটাকে স্থানচ্যুত করা যায় না। এর ফলে রক্তনালী সরু হয়ে যায় ও ওই রক্তনালীর উপর নির্ভরশীল অঙ্গ বা অঙ্গের কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তনালী সরু হয়ে গেলে কর্মক্ষমতা হ্রাসকারী ''ক্রনিক ইসকিমিক হার্ট ডিজিস'' অথবা মারণাত্মক হার্ট অ্যাটাক হয়। যদি মস্তিষ্কের রক্তনালী সরু হয়ে যায়, তবে সেরিব্রাল স্ট্রোক (সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে যাবার ফলে সংকটজনকভাবে রক্তপ্রবাহ হ্রাস, বা সেরিব্রাল ইনফার্কট (cerebral infarct) বা রক্তনালী ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (সেরিব্রাল হিমোরেজ,cerebral haemorrhage) হবার আশঙ্কা তৈরি হয়। হৃদ্‌রোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ইত্যাদি রোগগুলোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এগুলোর সব ক-টার মূল কারণ এথেরোস্ক্লেরোসিস। স্থানভেদে, অর্থাৎ যে অঙ্গে এথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে, সেই অঙ্গের রোগ হয়। ফ্যাটি লিভারের মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টিকারী ন্যাশ (NASH), প্রদাহবিহীন ফ্যাটি লিভারের (NAFLD) চেয়ে বেশি হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। প্রাথমিক পর্যায়ের ফ্যাটি লিভার থেকে ন্যাশ-এর উপস্থিতি পার্থক্য করা ও ন্যাশ-এ রূপান্তরের সম্ভাবনা নিরূপণ করার জন্য লিভারের বায়োপসি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য (gold standard) উপায়, কিন্তু ঝকমারি। এর পরিবর্তে কিছু সহজ স্কোরিং পদ্ধতি আছে (NAFLD fibrosis score)। ন্যাশ-এর উপস্থিতি নির্ণয় এই কারণে জরুরি যে, এর হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা বেশি আর এর দীর্ঘমেয়াদি কুফল হিসাবে অনিরাময়যোগ্য লিভারের সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সবশেষে মনে রাখতে হবে, একই পরিমাণের ফ্যাটি লিভার পশ্চিমী দেশবাসীদের থেকে ভারতীয়দের ইনসুলিনে অংসংবেদনশীলতা দুই গুণ বেশি হবে। বা অন্য কথায়, ফ্যাটি লিভার ভারতীয়দের পক্ষে বিপদ সংকেত হিসেবে বেশি জোরালো।

চিত্র ৫.

মেটাবোলিক সিন্ড্রোম

পরিভাষায় সিন্ড্রোম কথাটার অর্থ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রোগলক্ষণের সমষ্টি, যেটা সাধারণত একটা বিশেষ রোগের অস্তিত্ব বোঝায়। মেটাবোলিক সিন্ড্রোম (Metabolic Syndrome) নামে এমন একটা রোগলক্ষণের সমষ্টি আছে, যেটা ডাক্তাররা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় ব্যবহার করে থাকেন। হৃদ্‌রোগ বা বৃহদার্থে এথেরোস্ক্লেরোসিস রোগের শুরুর আগে শরীরে যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো চলতে থাকে সেটা হল মেটাবোলিক সিন্ড্রোম। এই অবস্থায় যকৃতে ও শরীরে অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়ার ফলস্বরূপ ইনসুলিন অসংবেদনশীলতার (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স) উদ্ভব হয় ও চর্বি-নিঃসৃত লেপটিন ও সমপ্রকারের হরমোনের প্রভাবে প্রদাহের (inflammation) সৃষ্টি হয়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ও ক্ষতিকারক লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য প্যানক্রিয়াস থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন রক্তে মিশতে থাকে (hyper-insulinaemia)। সেই অবস্থায় রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা থাকে বেশি। সেই ইনসুলিন গুণগতভাবে কর্মক্ষম হলেও, গ্লুকোজ ব্যবহারকারী কোষসমূহ (যেমন মাংসপেশি) ইনসুলিনে অপেক্ষাকৃতভাবে অসংবেদনশীল থাকে। রক্ত থেকে গ্লুকোজ অণুকে মাংসপেশি ও অন্যান্য কোষের বাইরের আবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে হলে কোষের আবরণটিকে ইনসুলিনের প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল থাকতে হয়। মেটাবলিক সিন্ড্রোমে কোষের আবরণের এই সংবেদনশীলতা কমে যায়। তাই রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বেশি থাকলেও দেহকোষের আবরণের ইনসুলিন অসংবেদনশীলতার জন্য রক্তে গ্লুকোজ দেহকোষের মধ্যে ঢুকতে বাধা পায় ও ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হয়। মেটাবলিক সিন্ড্রোমের ফলস্বরূপ অতি-লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও ঊর্ধ্বমুখী হয়, রোগপ্রতিরোধকারী গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে থাকে আর রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য লিভার থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে কোয়াগুলেশন প্রোটিন ও প্রদাহ-নির্ণায়ক সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন বা CRP বেশি করে তৈরি হয়ে রক্তে মিশতে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলো অনেকটা স্নো-বলের মতো একে অপরকে বাড়িয়ে দেয়; অন্তিম পরিণতি হিসাবে রক্তনালীর মধ্যে এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক বা প্রদাহ সৃষ্টিকারী কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ পদার্থ জমতে থাকে। এক কথায়, মেটাবোলিক সিন্ড্রোম আপাত-নিরীহ ফ্যাটি লিভার থেকে হৃদ্‌রোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো মারাত্মক রোগের মাঝখানের এক পর্ব। ইন্টারন্যাশানাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন মেটাবোলিক সিন্ড্রোমের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য এই নির্দেশিকা জারি করেছে: নাভি বরাবর পেটের পরিসীমার মাপ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে ৯০ সেন্টিমিটার ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮০ সেন্টিমিটারের বেশি ও তার সঙ্গে নীচের অবস্থাগুলোর মধ্যে অন্তত দু-টো—(১) খালি পেটে রক্তে সুগারের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের বেশি, (২) খালি পেটে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১৫০ মিলিগ্রামের বেশি, (৩) সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৪০ মিলিমিটার এবং/অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিলিমিটারের বেশি (৪) রক্তে গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারের ৪০ মিলিগ্রামের কম।

ফ্যাটি লিভারের রোগের দাওয়াই

ফ্যাটি লিভার হল এমন এক রোগ, যার সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধটি সবচেয়ে সস্তা বলে কম আবেদনের আর অকাজের ওষুধটি সবচেয়ে দামি আর বেশি

জনপ্রিয়। এটা বেশ জানা আছে যে, স্থূলতা কমাতে পারলে ফ্যাটি লিভার থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করে তো শরীরের ওজন কমানো যাবে না। ফ্যাটি লিভারের চটজলদি ক্রয়যোগ্য ম্যাজিক-চিকিৎসা নেই। ওজন কমানোর প্রয়োজনে খাবারে রাশ টানা আর ব্যায়ামের অপরিহার্যতা এখন আর অজানা গোপন রহস্য নয়। প্রাকৃতিকভাবে শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার ছন্দ তৈরি না হলে, সচেতনভাবে প্রতিটি গ্রাসের হিসেব রেখে খেতে হবে। ডায়েট চার্টের হিসেব মিলিয়ে খাদ্যশস্যের ওজন করে খাওয়ার ঝকমারি সামলে দিনের শেষে সরল পাটিগণিতের হিসেব-নিকেশ করাটা আর সরল থাকে না। দিনের পর দিন একঘেয়ে খাবারও আর মুখে রোচে না। এই তো গেল ডায়েট চার্টের অসুবিধা। ব্যায়ামের ব্যাপারে অনেকের অস্পষ্ট ও ভুল ধারণা আছে। গলদঘর্ম হয়ে যাবার অ্যারোবিক ব্যায়াম, অর্থাৎ জোর কদমে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার হাঁটা, ধীর ছন্দে ছোটা (জগিং), স্কিপিং, ট্রেডমিলে হাঁটা, সাঁতার কাটা ইত্যাদির বদলে কম খাটুনির অতি-ধীরলয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে হাত পা ছোঁড়া বা ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ার যৌগিক ব্যায়াম বেশি জনপ্রিয়। এই শেষোক্ত কম খাটুনির ব্যায়ামে শক্তিক্ষয় (ক্যালোরি খরচ) নগণ্য, তাই ওজন কমে না, লিভারের ফ্যাটও ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। প্রয়োজন হল স্বাস্থ্যকর খাবারের মূল সূত্রগুলো বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝে নিয়ে সচেতনভাবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসটা অভ্যাসে পরিণত করা, ঘাম ঝরানো অ্যারোবিক ব্যায়াম করাটা আসক্তিতে পরিণত করা। এটাই হল ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা। মেটফরমিন নামে একটি ডায়াবেটিসের ওষুধ অনেক সময় চিকিৎসকগণ ফ্যাটি লিভারে ব্যবহার করে থাকেন। তবে এটি একটি আপোশের চিকিৎসা। এতে লিভার ফ্যাট বিন্দুমাত্র কমে না, ফ্যাটি লিভারের কিছু কুফলের নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। যেমন ফ্যাটি লিভারের জন্য তৈরি হওয়া ইনসুলিন অসংবেদনশীলতা (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স) মেটফরমিন গ্রহণে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই কাজটাও উপযুক্ত পরিমাণে অ্যারোবিক ব্যায়াম মেটফরমিন-এর চেয়ে ভালোভাবে করার ক্ষমতা রাখে।

চিত্র ৬.

সারমর্ম

ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে অতিরিক্ত চর্বি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থূলতার এক অভিশাপ, যেটাকে পরিভাষায় নন্ অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিস বলে। কখনো কখনো এর দীর্ঘমেয়াদী কুফল হিসাবে নন্ অ্যালকোহলিক স্টিয়্যাটো হেপাটাইটিস বা ''ন্যাশ'' নামে ফ্যাটি লিভারের এক প্রদাহযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ন্যাশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অনিরাময়যোগ্য লিভারের সিরোসিস হবার সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আধুনিক মানবগোষ্ঠীর স্থূলতার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাটি লিভারের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থাৎ ''নন্ অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিসের'' প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনিবার্য কুফল হিসাবে বেড়ে যাচ্ছে ইনসুলিনে অসংবেদনশীলতা ও মেটাবলিক সিনড্রোম। মেটাবলিক সিনড্রোমের ফলস্বরূপ আমরা আক্রান্ত হচ্ছি উচ্চ রক্ত চাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, কিডনি ফেলিয়োর ইত্যাদি অনিরাময়যোগ্য এথেরোস্ক্লেরোটিক দলভুক্ত রোগের সমাহারে। ফ্যাটি লিভারের কোনো ম্যাজিক ওষুধ নেই যেটা খেলে এটা সেরে যেতে পারে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চাই একমাত্র এই রোগ থেকে আমাদের সুরক্ষিত করতে ও এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগ নিরাময় করতে পারে।

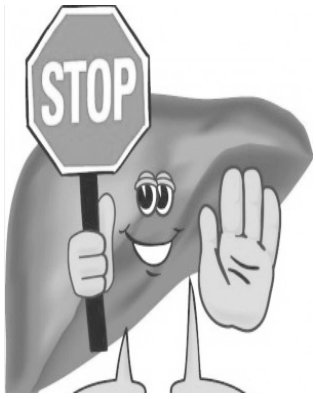

চিত্র ৭.

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডি.এম., কার্ডিয়োলজিস্ট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

কিডনির পাথর—দু-চার কথা

আজকের দিনে কিডনির পাথর কথাটা পত্রপত্রিকা মারফত বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আর খুব অপরিচিত নয়। প্রথম শুনলেই একটা কথা মাথায় আসে—কিডনির ভিতর পাথর কীভাবে হয়? আর কিডনিতে পাথর হলে ক্ষতি বা কী? কী খেলে বা কোন কোন রোগে পাথর হবার সম্ভাবনা বেশি? কখন আমরা বুঝব কিডনির পাথরের সমস্যা হতে পারে? কী কী পরীক্ষা করালে নিশ্চিত হতে পারব? কীই-বা তার চিকিৎসা? আচ্ছা, গলব্লাডারে পাথর হলে তো অপারেশন করে গলব্লাডার বাদ দিতে হয়—কিডনির পাথর হলেও কি কিডনি বাদ দিতে হয়? এমনি নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন **ডা. সৌম্যকান্তি বাগ**।

কিডনির পাথর রাসায়নিকভাবে কয়েকরকম যৌগ দিয়ে তৈরি হয়। যেমন---- (১) অক্সালেট—সব থেকে বেশি পাথর এইরকমই হয় (প্রায় চার ভাগের তিনভাগ), (২) ফসফেট—সাধারণত মূত্র-সংক্রমণের সঙ্গে এরকম পাথর দেখা যায়, (৩) ইউরিক অ্যাসিড, (৪) সিসটিন, (৫) জ্যানথিন, (৬) স্ট্রুভাইট ইত্যাদি। এরমধ্যে কোনোটির আকার হয় খাঁজকাটা, কোনোটি মসৃণ, গোল, কোনোটি ডাম্বেল আকৃতি কোনোটি বা ছয়কোণা। তবে তাতে রোগের উপসর্গ বা চিকিৎসার বিশেষ তারতম্য হয় না।

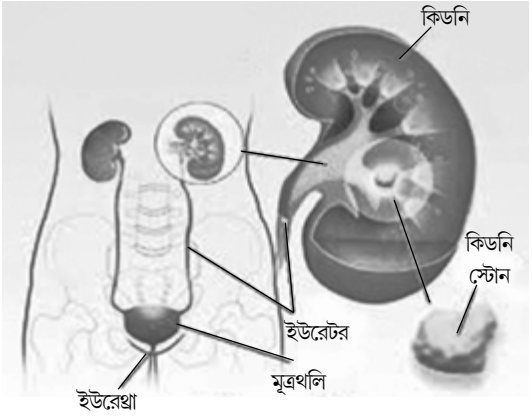

চিত্র ১. কিডনিতে পাথর

কেন হয় পাথর?

অনেকগুলি কারণে পাথর হতে পারে বৃক্ক (কিডনি), গবিনি বা মূত্রথলিতে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কী কারণে পাথর তৈরি হয়েছে তা রোগীর চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। কেননা এই কারণগুলি বেশিরভাগই রোগপ্রতিরোধে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না। এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে এই কারণগুলি অন্বেষণ করে তাকে প্রতিরোধ করতে হলে অনর্থক ব্যয়বহুল পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়। তাই একমাত্র যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে একাধিকবার কিডনির পাথর হয় (এমনকী অপারেশনের পরও) বা দুই দিকের কিডনিতেই পাথর দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রেই এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এই কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—খাবারে ভিটামিন-এ-এর অভাব, গরম আবহাওয়া, সাইট্রেটের অভাব, মূত্র সংক্রমণ (বিশেষত—ই কোলাই, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, প্রোটিয়াস ইত্যাদি জীবাণু), দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকা, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিসম (ফলত হাইপারক্যালসিউরা, অর্থাৎ মূত্রে ক্যালশিয়ামের মাত্রাবৃদ্ধি), হাইপার অক্সালুরিয়া, সিসটিনিউরিয়া, ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অন্যান্য কয়েকটি রোগেও পাথরের সম্ভাবনা বাড়ে। যথা—রেনাল টিউবিউলার অ্যাসিডোসিস, গাউট, মাল্টিপল মায়েলোমা (একরকম রক্তের ক্যানসার) সারকয়ডোসিস, ক্যানসার চিকিৎসা ইত্যাদি। এ ছাড়া যেকোনো কারণ যাতে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায় (যেমন—জল কম খাওয়া), অথবা কিডনি বা মূত্রথলির কোনো অংশে মূত্র জমা হয়ে থাকে—তাতে পাথর হতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রেই তা হবেই এমনটা নয়।

কখন ভাববেন আপনার কিডনির পাথর হতে পারে?

কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের অন্যান্য অংশের পাথর তৈরি হলে তার উপসর্গ হতে পারে অনেকরকম, নির্ভর করে কোথায় পাথর হয়েছে তার ওপর। উপসর্গগুলি হল—

১. **পেটে ব্যথা:** কিডনির পাথরের জন্য ব্যথা হয় (রেনাল কলিক) পেটের পাশের দিকে বা পিছন দিকে। সাধারণত এই ব্যথা হয় কামড়ে ধরার মতো, সঙ্গে বমিভাব। অনেক সময় ব্যথা কুঁচকির দিকে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ পর এই ব্যথা নিজেই কমে যায়। অনেকসময় ব্যথার ওষুধপত্র দিতে হয়, অনেকসময় পেচ্ছাপ করার পর ব্যথা নিজেই কমে যায়

২. **মূত্রের সঙ্গে রক্তপাত (হিমাচুরিয়া)।**

৩. **জ্বর:** সাধারণত এক্ষেত্রে মূত্র সংক্রমণ হয়।

৪. **উচ্চরক্তচাপ**

৫. **পেটফোলা (হাইড্রোনেফ্রোসিস):** পাথরের কারণে মূত্র কিডনিতে আটকে পড়লে এই সমস্যা হয়।

অন্যান্য উপসর্গ—গা-বমিভাব, বমি, ঘাম দেওয়া, পেচ্ছাপের সময় যন্ত্রণা ইত্যাদি।

পরীক্ষানিরীক্ষা

প্রথমেই বলে রাখি ওপরের উপসর্গগুলি থাকলেই সবসময় কিডনির পাথর হবেই তা নাও হতে পারে। সুতরাং নিজে নিজে কিডনি স্টোনের পরীক্ষানিরীক্ষা না করে কোনো ডাক্তারকে দেখানোই উচিত।

অ্যাপেনডিসাইটিস, কোলাইটিস, কিডনি বা মূত্রথলির টিউমার, ক্যানসার, ইত্যাদি বেশ কিছু কারণে এই উপসর্গগুলি হতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য যে পরীক্ষাগুলির প্রয়োজন হয় সেগুলি হল—'পেটের ইউ.এস.জি', 'এক্স-রে—কিডনি, ইউরেটার ব্লাডার বা X-Ray-KUB'। এ ছাড়াও পেচ্ছাবের সাধারণ ও মাইক্রোস্কোপিক (Urine R.E. & M.E.) পরীক্ষা করতে হয় সংক্রমণের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য। কিডনির কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন দেখা হয়। কিডনির কর্মক্ষমতা দেখতে এবং হাইড্রোনেফ্রোসিস নির্ণয় করতে আই.ভি.ইউ বা ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রম (I.V.U), সিটিস্ক্যান এবং রেনাল স্ক্যান করতে হয় অনেকসময়।

চিত্র ২. কিডনিতে বিভিন্নরকম পাথর

বহুদিন ধরে থাকা পাথরের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকসময় কিডনির কর্মক্ষমতা এতই কমে যায় যে অপারেশন করে কিডনি বাদ দিতেও হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ

কিডনির পাথর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যায়; খুব ছোটো পাথর থাকলে (০.৫ সেমির চেয়েও ছোটো) সবসময় অপারেশনের দরকার হয় না।

❖ বেশি করে জল খেতে হবে। (দিনে ৩-৪ লিটার)। দেখা গেছে যথেষ্ট জল খেলে ০.৫ সেমি পর্যন্ত পাথর (এমনকী অনেক সময় ১ সেমি পর্যন্তও) পেচ্ছাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

❖ **খাদ্যভ্যাস:** আগেকার দিনে অক্সালেটযুক্ত খাবারদাবার (যথা—পালং শাক, চা, কোকাকোলা, মদ, লেবু জাতীয় ফল) খেতে বারণ করা হত। তবে এসবের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি, তাই আজকাল ডাক্তাররা এইসব খাবার খেতে বারণ করেন না।

❖ **অ্যালকালি সিরাপ:** পেচ্ছাবের ক্ষারীকরণ (Alcalinization of urine) আগেকার দিনে কিডনি স্টোনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখনও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি।

❖ **ডাই-ইউরেটিক** (যেমন-ফুসেমাইড)—দ্বারা পেচ্ছাপের পরিমাণ বাড়িয়ে. ক্ষুদ্র পাথরগুলি বের করে দেওয়া হয়।

অ্যান্টিবায়োটিক: মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে পাথর তৈরি কমানো যায়। আবার পাথরের কারণে মূত্রনালীর সংক্রমণ হওয়া প্রতিরোধ করতেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়।

যথাযথ ও দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা

সাধারণত ০.৫ সেমির চেয়ে বড়ো পাথর, অথবা যদি পাথরের কারণে কিডনির মাধ্যমে শরীরের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, অথবা যদি পাথর ব্যথা বা সংক্রমণের কারণ হয়, তাহলে পাথর বের করার চেষ্টা করা উচিত। তবে এক্ষেত্রেও কোনো ইউরোলজিস্টের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আজকাল পাথর বার করার অপারেশন ছাড়াও অনেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যেগুলি অনেক কম যন্ত্রণাদায়ক, অপারেশন পরবর্তী ঝুঁকিও থাকে না।

ক. অপারেশন

কিডনির ভিতরের পাথর বের করার অপারেশন হল নেফ্রোলিথোটমি (Nephrolithotomy)। গবিনীর পাথর বের করার অপারেশনকে বলা হয় পায়েলোলিথোটমি (pyelolithotomy)। একইভাবে মূত্রথলির পাথর বের করা হয় সিসটোলিথোটমি (cystolithotomy) করে। তবে এই অপারেশনগুলি আজকাল বিরল হয়ে উঠেছে। যেসমস্ত পাথর অপারেশন ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে বের করা যায় না, বা যখন পাথরের সঙ্গে মূত্র পরিবহণের পথে কোথাও বাধা থাকে তখনই এই অপারেশনগুলি সাধারণত করা হয়। ল্যাপোরোস্কোপির সাহায্যেও অপারেশন করা যায়। তবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব লাভজনক হয় না।

খ. অপারেশন ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতি

এখনকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের অন্যান্য অংশের পাথর এই পদ্ধতিতেই বের করা হয়।

১. ECSWL বা এক্সট্রা কর্পোরিয়াল শক ওয়েভ লিথোট্রিপসি: এই পদ্ধতিতে বাইরে থেকে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের দ্বারা 'শক ওয়েভ' তৈরি করে শরীরের মধ্যেই পাথরগুলিকে গুঁড়ো করে ফেলা হয়, যা পরে পেচ্ছাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

২. PCNL বা পেরকিউটেনিয়াস নেফ্রোলিথোটমি: এ পদ্ধতিতে শরীরের বাইরের দিক থেকে কিডনির ভিতরের পাথর পর্যন্ত ছুঁচ ফুটিয়ে একটি রাস্তা (নলাকৃতি) তৈরি করা হয় যার মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে পাথর বের করা হয়। আজকাল এর সঙ্গে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ বা লেসার তরঙ্গের সাহায্যে পাথর গুঁড়ো করার নীতিকে মিলিয়ে কিডনির প্রায় যেকোনো অংশের, প্রায় যেকোনো আকারের পাথরই বের করা সম্ভব হচ্ছে।

৩. সিস্টোস্কোপি ও ইউরেটেরোস্কোপির সাহায্যে (Cystoscopically/ureteroscopically) এই পদ্ধতিতে এন্ডোস্কোপির সাহায্যে সরাসরি দেখে এবং প্রয়োজনে শক ওয়েভ বা লেসারের সাহায্যে গুঁড়ো করে পাথর বের করা হয়।

চিকিৎসা না করলে কী ক্ষতি?

সবই তো হল কিন্তু এত ঝামেলা না করলেই নয় ডাক্তারবাবু? অতটুকু পাথর থাকলেই বা ক্ষতি কী? ক্ষতি আছে বৈকী। পাথর বড়ো হলে এবং অনেকদিন থাকলে তা মূত্র পরিবহণের পথ অবরোধ করে। ফলে দীর্ঘদিন কিডনি ও গবিনীতে জমা মূত্র থেকে সাংঘাতিক সংক্রমণ হতে পারে। তা ছাড়া, মূত্র জমা হওয়ায় কিডনির কার্যকারিতাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। যা শেষপর্যন্ত প্রাণঘাতী কিডনির অসুখ ক্রনিক রেনাল ফেলিওর (chronic renal failure) ডেকে আনতে পারে।

ডা. সৌম্যকান্তি বাগ, এমবিবিএস, এমএস, জেনারেল সার্জন। শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের ভুবন**

রঙ্গন ভালোবেসে

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

থোকা থোকা রঙ্গন
গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে
তোর সিঁথির ফাঁদে ছুঁড়ে দিয়ে
বলেছি—এই নে পরুষ ভালোবাসা।

ঘর একটা চেয়েছিলি
আঁতুর কেটে যেতেই—
দিয়েছি।
এক ঘরে না পোষালে
বারো ঘর—তাও দিয়েছি।

হেঁশেলে কলতলায়
ভাতের থালা হাতে নিয়ে
মুখে তুলে দিতে দিতে
নাক সিঁটকানি কাঁধ ঝাকানি আর
উপেক্ষা পেতে পেতে—
ভেবে নিয়েছিলি বুঝি,
এই তবে ভালোবাসা!

ঘরে ঘরে ফোটা ফুল কাটে পোকায়—
দেওর ভাশুর শ্বশুর বাবা কাকা মামা জ্যাঠা
তুতো দাদা-ভাইদের দঙ্গলে পাড়াতুতোরাও শামিল;
আর আর সব গুরু ব্রহ্মা নেতা-ক্যাতাদের
কোলেপিঠে, হাতে হাতে কারুকাজে;
পথেঘাটে বাসেট্রামে পল-অনুপল দলিত মথিত হতে হতে
সময়ের ঢের ঢের আগে
তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করেই
পতিস্পর্শ জানা হয়ে গেছে কায়াবৃতা-তোর।
তবু প্রাণে ধরে পেতে চাস তুই
গাছভরা রঙ্গনপ্রেম!

আয়, তবে তোকে দিই আরও ভালোবাসা
রণাঙ্গনে মুক্ত দুনিয়ার শপথ শিবিরে রাতবিরেতে
পেতে নে দ্রৌপদী-শয্যা তোর।
তোকে নিয়ে প্রগতি প্রতিক্রিয়ার লোফালুফি
খেলতে খেলতে আমাদের তৃপ্ত উদ্‌গার
আর তোর বুকেপিঠে সেঁটে দিই
নষ্টা, ভ্রষ্টা, কুলটা স্বৈরিণী
বারোভাতারি খানকি বিশেষণ।

আমরা তো উজার করে দিয়েছি তোকে
আমাদের পৌরুষ-বল।
সইল না, কিছুতেই সইল না তোর!

কেন তবু বনপত্রমর্মর সমুদ্রসফেন
ব্যাপ্ত চরাচরে পুরবিয়া অনুরণিত নিস্বনে
ছড়িয়ে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তরে—
রঙ্গন! রঙ্গন!
কেন তবু মনে হয় তোর
রক্তের থেকেও লাল
রঙ্গন, শুধু তোর রঙ্গন।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের ভুবন**

কেন ধর্ষণ?

এক সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আমাদের সমাজে যখন একজন মানুষের ওপর অত্যাচার হয় এবং সেই অপরাধ রাষ্ট্রের বিরাট বিচারব্যবস্থার মাপকাঠিতে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয় তখন অপরাধীর মাথা লজ্জায় অবনত হবার রীতিটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়ায় নিয়ম চালু আছে। কিন্তু মান্ধাতার আমল থেকে এর উলটো খেলাটাও চলে আসছে আমাদের সমাজে। এক্ষেত্রে অপরাধী নয়, যে অত্যাচারিত তাকেই লজ্জায় অপমানে হয় পুড়ে মরতে হয়, নয়তো গলায় দড়ি দিতে হয় নয়তো-বা মুখ ঢেকে অপরাধের সব দায়ভার বহন করে নির্বাসনে যেতে হয়। কারণ সামাজিক চাপের তুলনায় কেরোসিন ঢেলে জ্বালা আগুনের আঁচ কিছুটা কমই বোধ হয়। কিন্তু অত্যাচারিত, অর্ধমৃত সে মানুষটার মৃত্যুও তখন ' হয় না সফল, হয় না সফল'। কারণ তার মৃত্যু তখন তার পরিবার-পরিজনের লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কী সেই অপরাধ যা নিয়ে এত লজ্জা; যা কিনা কেবল ফিসফিস করে আলোচনা করা যায়? যে অপরাধসংক্রান্ত ডকুমেন্টারি আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রচার করার অনুমতি দিতে ভয় পায়—অনুমতি না দেওয়ার কারণ স্পষ্ট করে উল্লেখিত হয় না, কেবল ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় চলতেই থাকে? সেই অপরাধ যা কিনা অপরাধীর থেকে বেশি অত্যাচারিতকে লজ্জিত করে সেই নিয়েই এবারের প্রতিবেদন ধর্ষণ— সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ধর্ষণ-নামক অপরাধটির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা। কারণগুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো-বা মানবসমাজ এমন ঘৃণ্য জঘন্য অপরাধের কবল থেকে মুক্ত হবার একটা পথ খুঁজে পেলেও পেতে পারে। আগে মনে করা হত অস্বাভাবিক যৌন তাড়নার বশবর্তী হয়ে (যা হয়তো-বা নারীর যৌন উদ্দীপক পোশাক-আশাক বা আচরণজনিত প্ররোচনার ফল!) এই অপরাধ ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে মনে করা হচ্ছে ধর্ষণ আসলে হিংস্রতার প্রকাশ। নারীর প্রতি হিংস্রতাকে যৌনতার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্যই ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় জানা যাচ্ছে মুষ্টিমেয় ধর্ষক (rapist) অস্বাভাবিক যৌন তাড়নার শিকার বা মর্ষকামী (saddist)। অধিকাংশ ধর্ষক এই অপরাধ ঘটান সাময়িক ঝোঁকের বশে, পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে।

এ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা। পেনাইল প্লেথিসমোগ্রাফ(Penile Plethysmograph) নামক যন্ত্রের সাহায্যে গবেষকরা পুরুষের যৌনাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন পরিমাপ করতে পারেন। ডা. বারবারী (Dr Barbaree) তাঁর গবেষণায় জানান যে যখন পুরুষ মানুষদের কোনো ধর্ষণের ঘটনার বিশদ বর্ণনা শোনানো হয় তখন তাদের যৌন উত্তেজনাজনিত যৌনাঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন, কোনো উভয়-স্বীকৃত যৌন ভালোবাসার (Consented love-making) দৃশ্য দেখার ফলে যে উত্তেজনা তার তুলনায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। [October, *The Journal of Clinical and Consulting Psychology*.'Violence as Sexual Inhibitor'] ওঁর মতে ৫০ শতাংশ রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ার অর্থ পুরুষটি কোনোমতেই সঙ্গম করতে পারবে না। একইসঙ্গে তিনি এমন তথ্যও জানালেন যে যারা এই অপরাধ করছে তাদের ১০ শতাংশ ধর্ষণের ছবি বা ভিডিও দেখে উত্তেজিত হয়েছে। অন্য আর এক গবেষণায় ডা. জেনে আবেল [Dr Gene Abel এমোরি ইউনিভার্সিটির মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist)] দেখেছেন যারা ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত তাদের মধ্যে যৌন নিপীড়নের দৃশ্য বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এবং এই উত্তেজনা যার মধ্যে যত বেশি এই অপরাধ সে তত বেশিবার ও তত বেশি নিষ্ঠুরভাবে করেছে। অনেক গবেষণার পর গবেষকরা দেখতে চেয়েছেন কোন পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ পুরুষের উত্তেজনা একজন ধর্ষকের উত্তজনার সঙ্গে তুলনীয়। তাতে দেখা যাচ্ছে নারীর প্রতিবিদ্বেষ বা রাগ ধর্ষকের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। বহু গবেষণার পরে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ধর্ষক কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ নন। যেকোনো সাধারণ মানুষই বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্ষণের মতো অপরাধ করে থাকেন, যদিও ধর্ষণের কারণ, পরিস্থিতি ও ধরন ব্যক্তিবিশেষের জন্য আলাদা হয়।

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে ধর্ষণ যদি কেবল কাম-তাড়নার ফল না হয় তবে কোন মানসিকতা একজন সাধারণ পুরুষমানুষকে ধর্ষণের মতো অপরাধ করতে প্ররোচিত করে?

একজন পুরুষ যখন অন্য কোনো পুরুষের ওপর রাগ বা বিদ্বেষজনিত হিংসার প্রকাশ ঘটাচ্ছে তার আচরণ সচরাচর কীরকম হয়? সে বিভিন্ন উপায়ে তাকে আঘাত করতে চায়। কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে, মারধোর করে বা খুন করে সে তার হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু সেই পুরুষই যখন একজন মহিলার প্রতি তার রাগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করতে চাইছে তখন সে মারধোর আক্রমণ, খুন, জখম, ছাড়াও ধর্ষণ নামক এই বিশেষ উপায়টি বেছে নিচ্ছে তার হিংস্রতাকে প্রকাশ করার জন্য। এই বিশেষ অপরাধটির পিছনে তবে কোন মানসিকতা কাজ করছে এবং সমাজের ভূমিকাই বা সেখানে কতটা?

যৌন নিগ্রহ এমনই এক অপরাধ যে অপরাধে নিপীড়িত মহিলাটির সামাজিক সম্মান ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। আমাদের ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে 'কুমারীত্ব'(Virginity) নামক এক সামাজিক সংস্কারের বোঝা মেয়েদের মাথায়

চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর আছে 'সতীত্ব'। এই দুই 'ঈত্ব' হারিয়ে গেলে জীবন অর্থহীন, তা মৃত্যুরই শামিল। কাজেই একজন মহিলাকে শায়েস্তা করার সব থেকে বড়ো হাতিয়ার হল 'ধর্ষণ'। অন্যায়ের প্রতিবাদ করো—শাস্তি ধর্ষণ! রুখে দাঁড়াও—শাস্তি ধর্ষণ। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে তাচ্ছিল্য দেখালে—শাস্তি ধর্ষণ। সে আটই হোক বা আশি, মহিলামাত্রই এই শাস্তি। এমনকী যে রাষ্ট্র মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার বুলি আওড়ায় সেই রাষ্ট্রের ধ্বজাধারীরা মন্ত্রী পুলিশ মিলিটারি কেউই বাদ যায় না সময় সময় বুঝে নারীদের প্রতি এই জঘন্য অপরাধটি সম্পন্ন করতে। কামদুনি, রাণাঘাট, মিজোরাম, দিল্লি সব ঘটনাই একাকার হয়ে একটাই সারমর্ম উঠে আসে—'দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার'।

মেয়েটির চরিত্র ঠিক ছিল না

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা নারীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার পোশাক, তার গতিবিধি, তার বাক্ স্বাধীনতা। তার যৌন জীবনের ওপর নজরদারির শেষ নেই। আর কোথাও কোনোখানে কোনো মহিলা সেসব বেড়াজাল মানতে না পারলেই শাস্তি—ধর্ষণ। গোটা পৃথিবী জুড়েই চলছে এই অত্যাচার। আজকের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা নারীর ভূমিকা বদলে দিয়েছে অনেকখানি। শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামাঞ্চলেও মেয়েরা ঘরের কাজ ছাড়াও নানা স্বনির্ভরতা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তারাও বয়স্ক শিক্ষার দৌলতে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে পুরোনো সংস্কার উড়িয়ে দিতে চাইছে। সর্বোপরি, তাদের হাতে দু-পয়সা আসতে শুরু করেছে। এই ভূমিকা বদলও কিন্তু অনেকক্ষেত্রে পুরুষদের রাগ ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘরের বউ বাইরে কাজে যাচ্ছে মানেই তাকে সন্দেহ করা হবে এমনটাই চলে আসছে। একজন পুরুষ নির্দ্বিধায় একাধিক নারীসঙ্গ করতে পারে। তার ক্ষেত্রে সেই যৌন স্বাধীনতা সমাজপতিরা 'পুরুষ মানুষের অমন একটু-আধটু দোষ থাকেই' বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু মহিলা কোনো বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ে জড়িয়ে পড়লে পঞ্চায়েত ডেকে তাকে গণধর্ষণের বিধান দেওয়া হয়। স্বাধীনতার আটষট্টিতম বছরে পা দিল আমাদের দেশ—Sovereign, Socialist, Secular Democratic Republic। এ দেশে 'মায়ের মন্দির' কত আছে গুনতে বললে বোধহয় আকাশে তারা গোনার মতোই অনন্ত চিহ্ন বসাতে হবে। আমাদের দেশ 'মাতৃভূমি' বলেই পরিচিত তবু এদেশেই চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষিত হতে হয় ও সেই গ্লানি থেকে মুখ লুকিয়ে পালাতেও হয়। তার পিছনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই নগ্ন বৈষম্যমূলক আচরণই মূলত কাজ করছে। পুরুষের চোখে নারীর পরিচিতি কেমনটি হবে? ব্যক্তিত্বহীন, চিন্তাশক্তিহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন এক মাটির ঢেলা। তার ভূমিকা শুধুই পুরুষের মনোরঞ্জন করা আর তার যৌনসুখের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া। তার বাইরে কোনো প্রতিবাদ, ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, মনীষার পরিচয় কেন সহ্য হবে তার! প্রশ্ন ওঠে, তবে কি মেয়েদের অগ্রগতি কিছুই হয়নি? নাকি উচ্চশিক্ষিত মহলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে না, এ কেবল নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত সমাজেরই প্রতিফলন? ধর্ষণ নামক অপরাধটির যত লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক অভিযোগ অলিখিত থেকে যায়। কারণ সেই গোড়ার কথা পরিবারের মহিলা সদস্যটির যেকোনো একটা 'ঈত্ব'—সতীত্ব বা কুমারীত্ব হরণ পরিবারের কাছে চূড়ান্ত লজ্জার ও অপমানের। ধর্ষণের দ্বারা নির্যাতিতা মানসিক ও শারীরিকভাবে ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে আবার তাকে সমাজের রক্তচক্ষুর প্রকোপে জ্বলেপুড়ে মরতে হয় তিলে তিলে। এমন ঘটনা নতুন নয় যে ধর্ষিতা ঘটনার কিছুদিন পরে বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

হরণ করার অধিকার

'Rape' এই শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন 'rapere' শব্দ থেকে যার মানে হল 'to steal or seize'। ধর্ষণের মাধ্যমে নারীর সামাজিক সম্মান ছিনিয়ে নেওয়ার মানসিকতাই বিশেষভাবে কাজ করে। আর যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে বলশালী তাই তার বলপ্রয়োগ করে নারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা চিরকালের। আর এই মানসিকতাকে ইন্ধন জোগায় যৌন শিক্ষার অভাব। পৌরুষের একটা ভুল ইমেজ ছোটো থেকে পুরুষের মাথায় গুঁজে দেওয়া হয়। তাকে প্রতি মুহূর্তে বোঝানো হয় মেয়েরা দুর্বল তাই হেরে গেলে বা আঘাত পেলে সে কাঁদে কিন্তু পুরুষ হবে সিংহের মতো অর্থাৎ জন্তুর মতোই তার প্রক্ষোভের (emotion) ওপর নিয়ন্ত্রণ কম থাকবে। এ ব্যাপারে অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমগুলিও ব্যাপক হারে কাজ করে চলেছে। রাউডি রাঠোর খুব সহজেই হিরোইনের কোমরে চিমটি কেটে তাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। তার এই আচরণই তার পৌরুষের প্রকাশ। সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রেণির মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যম আর কী থাকতে পারে? বিশেষত ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে আশি শতাংশ মানুষ কৃষক বা শ্রমিক, সে দেশে চলচ্চিত্র নামক বিনোদনের ভূমিকা অপরিসীম। সেই চলচ্চিত্রে ধর্ষণ তো একমাত্র উপায় যার দ্বারা একজন পুরুষ (সিনেমায় সচরাচর ভিলেন) একজন মহিলাকে শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করতে পারে। অর্থাৎ কিনা ধর্ষণ এক বিশেষ মানসিকতার প্রকাশ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি মনোভাব ধর্ষণ নামক ঘৃণ্য অপরাধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো যায় যে ধর্ষণ যৌন-আচরণের এক প্রকার (type) নয় বরঞ্চ বলা যায় এটা পুরুষের শক্তি প্রদর্শনের এক উপায়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কারণ হল অনেক পুরুষ মানুষের মধ্যে মহিলাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঘৃণা কাজ করে, যাকে বলা হয় 'মিসোজিনি'

(misogyny)। দেখা গেছে যেসব পুরুষমানুষ শিশু অবস্থায় মা বা অন্য কোনো মহিলার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে বা মানসিক আঘাত পেয়েছে তারা সুযোগ পেলে অনেকসময় ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ করে ফেলে। আর মিসোজিনির সঙ্গে সাইকোপ্যাথিক ব্যক্তিত্বের মিশেল হলে নারীর প্রতি নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায় গিয়ে পৌঁছোয়। ধর্ষণ বিষয়ক দু-তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সেগুলি হল—

১। সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কীয় প্রাচীনপন্থী মত (conservatism)

২। সমাজে পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কীয় উন্নাসিকতা (sense of Grandeur)

৩। নারীর পবিত্রতা সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণা।

৪। শরীরের ওপর অধিকারজনিত মানসিকতা।

সর্বশেষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সালে ইউনাইটেড নেশন ছয়টি এশিয়া-প্যাসিফিক (ভারতসহ) দেশে সমীক্ষা করে দেখেছে ১০,০০০জন পুরুষমানুষের মধ্যে ২৫০০জন স্বীকার করেছে যে তারা কোনো-না-কোনো সময়ে তাদের নারীসঙ্গিনীকে ধর্ষণ করেছে। তারা মনে করে যে যৌনমিলনে তাদের ইচ্ছাই শেষ কথা। তাদের স্ত্রী বা সঙ্গিনী অসম্মত হলেও যৌনমিলন জোর করে করা ন্যায়সঙ্গত। গড়পড়তা একজন ভারতীয় পুরুষ পৌরুষ বলতে বোঝেন—'acting tough, freely exercising his privilage to lay down the rules in personal relationships and above all controlling women'—এমনটাই দেখেছেন ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর উইমেন, ২০১৪ সালে। সম্প্রতি মন্ত্রীমশাই বলে বসলেন বিবাহে ধর্ষণ নাকি ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রযোজ্য নয়। এমন এক মন্তব্য চায়ের কাপে তুফান তুলল। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির ঝড় বইল। অনেকে বললেন, এমন আইন (বিবাহিত জীবনে ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য) চালু হলে ভারতে পরিবার-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। আসলে সমস্যা পুরুষকে নিয়ে নয়, বিয়ে নিয়েও নয় এমনকী পরিবার নিয়েও নয়; সমস্যা পুরুষতন্ত্র নিয়ে। এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে আমরা কি পুরুষতন্ত্র ভেঙে নতুন করে সমাজ গড়তে পারব? দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনই এ ব্যাপারে নতুন দিশা দেখাতে পারে। এর জন্য দায়িত্ব কখনোই শুধু পুরুষমানুষের ওপর বর্তায় না। নারীর ভূমিকার বদল বিশেষ প্রয়োজন। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে—অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করা দরকার। ধর্ষণ নামক অপরাধটিকে সামাজিক সম্মানহানির ভয়ে লুকিয়ে রাখবেন না। অপরাধীকে লজ্জিত করুন। নিজে লজ্জায় আত্মগ্লানিতে ভুগবেন না। সর্বোপরি সরকারের কাছে দ্রুত সর্বতোগামী বিচার ও দাবি—দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্ত দিক থেকে আমূল পরিবর্তন কাম্য। পালটে ফেলতে হবে ধ্যানধারণাগুলিকে। সুতরাং একটাই শেষ কথা বলা যায়—'চল পালটাই'।

রুমঝুম ভট্টাচার্য, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও প্রাবন্ধিক।

With Best Compliment from

A. N. Pharmaceutical Laboratory

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের ভুবন**

নারী ধর্ষণ সম্পর্কে দু-চার কথা যা আমরা জানি অথবা জানি না

ধর্ষণ সমাজের এক গভীর অসুখ। যা সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে অথবা নারীদের একাংশ আগল খুলে বেরোনোর ফলে আমরা এর ভয়াবহতা আরও বেশি বেশি করে জানতে পারছি। এই নিবন্ধে ধর্ষণের কারণ অনুসন্ধান, ধর্ষণ সম্পর্কে সমাজ-মাথাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ষণ ও খুন এবং ধর্ষণ-উত্তর আইনি-ব্যবস্থার অসারতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন **ডা. অবন্তিকা পাল**।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের জনপ্রিয় গ্রুপে একখানা সুতো খোলা হয়েছিল। একটি নগণ্য সমীক্ষা। জানতে চাওয়া হয়েছিল—গ্রুপের মহিলা সদস্যরা গত ২০১৪ সালের ৩৬৫ দিনে ঠিক কতবার ইভটিজিং-এর মুখোমুখি হয়েছেন। রাস্তায়, অফিসে, বাজারে, কলেজে, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বিবিধ নোংরা মন্তব্য, খারাপ দৃষ্টি বা গায়ে হাত—এ সমস্তই মাথায় রেখে স্রেফ একটা সংখ্যার উল্লেখ। বলা বাহুল্য, উত্তরগুলো ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। মহিলাদের কাছ থেকে জবাব আসছিল—'অসংখ্যবার, গোনা সম্ভব নয়', 'মানেটা কী? 'মোর দ্যান হান্ড্রেড টাইমস আই গেস!', 'প্রায় প্রত্যেকদিনই কিছু না কিছু'—জাতীয়। এবং পুরুষরা কেউ বিস্মিত হচ্ছিল, কেউ বিশ্লেষণ করতে চাইছিল এরকমটা কেন, আর কেউ কেউ জানতে চাইছিল খারাপ দৃষ্টি ভালো দৃষ্টির তফাত করা যায় কীভাবে। না। সত্যিই এমন কোনো মানদণ্ড নেই বটে। পুরো ব্যাপারটাই ভুক্তভোগীর অনুমান বা দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর। প্রসঙ্গত, একটা গল্প মনে পরে গেল। বলি। ২০০৮ সালে, আমেরিকান উড়ানে ২১ বছর বয়সি এক তরুণী ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছিল। ঘুম ভাঙার পর লক্ষ করল, জনৈক পুরুষ সহযাত্রী তার দিকে হাসি হাসি মুখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি সন্দিগ্ধ হল ও আবিষ্কার করল ওই পুরুষটি তার দিকে তাকিয়ে হস্তমৈথুন করছে। পরিশেষে মেয়েটির চুলে বীর্যপাতও করে ফেলল। এরোপ্লেনটি নামার সঙ্গে সঙ্গে ভিকটিম পুলিশ ডেকেছিল, ও পরবর্তীকালে ক্ষতিপুরণও চেয়েছিল। তরুণী জানিয়েছিল, সহযাত্রীর দৃষ্টি যে 'স্বাভাবিক' ছিল না, সেটা প্রথম থেকেই আন্দাজ করছিল সে। ঘটনা সামান্য হোক বা সাজানো, ভিড় বাসে বৃদ্ধের করস্পর্শ স্নেহসূচক নাকি যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ, এ তারাই বোঝে যারা অহরহ এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার। মহিলার প্রোফাইল পিকচারে অন্তর্বাসের দৃষ্টিগোচরতা নিয়ে অবলীলায় মন্তব্য করাও তো এক প্রকার ইভটিজিং-ই, সে কমেন্টকর্তা 'মজা করেই' লিখে ফেলুক অথবা 'ভুল করে'! মহিলাদের প্রতি এইসব ছোটোখাটো যৌন হেনস্থাই কিন্তু বড়ো বড়ো আকার নিতে সক্ষম। এমনকী ধর্ষণ করতে বা ধর্ষনে ইন্ধন জোগাতেও। এ দেশে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত ধর্ষণের সংজ্ঞা অপরাধীদের সাজা দেওয়ার পথকে প্রশস্ত করছে ঠিকই, কিন্তু সার্বিকভাবে ঘটনার বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে পারছে কি? কী বলছে স্ট্যাটিসটিক্স? কী কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? স্রেফ আর স্রেফ সংখ্যাতত্ত্ব? সম্প্রতি আন্তর্জালে ভাইরাল হয়ে যাওয়া, লেসলি উডউইন-এর তথ্যচিত্র 'ইন্ডিয়া'জ ডটার'-এর সূত্রে নির্ভয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত মুকেশ সিং-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়ে পড়ল। নির্ভয়া ও তার পুরুষসঙ্গী ১৬ই ডিসেম্বর ২০১২-র রাতে যে মিনিবাসটিতে ওঠে, মুকেশ তার চালক ছিল। ধরা পড়ার পর প্রাথমিকভাবে সে অভিযোগ অস্বীকার করে, কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষায় তার বয়ান মিথ্যে প্রমাণিত হয়। বক্তব্যে মুকেশ জানায়, ''ধর্ষিত হওয়ার সময় মেয়েটির উচিত হয়নি পালটা প্রতিরোধ জানানো। বরং মুখ বুজে থাকা ও ধর্ষণ করতে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলেই তাকে 'করে' ছেড়ে দেওয়া হত আর ওই ছেলেটাকে (সঙ্গী) শুধুমাত্র মারধর করা হত। এক হাতে তো তালি বাজে না, সবসময় দু-টো হাতই লাগে। একজন ভদ্র মেয়ে কখনো রাত ন-টার সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় না। যেকোনো ধর্ষণকাণ্ডে ছেলেটির (ধর্ষকের) চেয়ে মেয়েটির (ধর্ষিতের) দায় অনেক বেশি থাকে। ছেলে আর মেয়ে কখনো সমান হয় না। ঘরের কাজকর্ম, পরিবারের দেখভাল এইসব মেয়েদের কাজ, রাত্রিবেলা ডিস্কোয় যাওয়া, বার-এ যাওয়া, খারাপ কাজ করে বেড়ানো বা বাজে পোশাক পরা নয়। আসলে মাত্র ২০ শতাংশ মহিলাই ভালো হয় যারা এগুলো করে না। (ধর্ষকের) ফাঁসির আদেশ হলে পুরো পরিস্থিতিটা মেয়েদের পক্ষে আরও খারাপ হতে পারে। আগে ধর্ষণ করার সময় বলা হত—আরে ছেড়ে দে, এ কাউকে বলবে না; এখন ধর্ষণ করার পর ছেলেরা, মানে যারা দুষ্কৃতী গোছের, ধরা পড়ার ভয়ে মেয়েটাকে খুন-ই করবে। মেয়েগুলো মরে যাবে . . .'' (সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ)। মুকেশের বক্তব্য সমাজের চেহারাটাকে আরেকটু স্পষ্ট করে দিল। বোঝা গেল, বিভিন্ন সামাজিক স্তরে আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত নির্বিশেষে, মানুষ (মানে পুরুষ, এমনকী নারীও) এই জাতীয় অশিক্ষার শিকার, যা ধর্ষণ ঘটায় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ষণকে প্রশ্রয় দেয়।

কাকে দিয়েছি রাজার পার্ট!!!

১. ১৬ ডিসেম্বর ২০১২-র দিল্লি-গণধর্ষণ প্রসঙ্গে ডিফেন্স-এর উকিল এ.পি.সিং:

যদি আমার নিজের মেয়ে বা বোন বিয়ের আগে যৌনতা করত এবং মাঝরাতে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত আমি তাকে ফার্মহাউস নিয়ে গিয়ে গায়ে পেট্রল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতাম। এই রকম ঘটনা ঘটতেই দিতাম না। সমস্ত অভিভাবকেরই এরকম মানসিকতা থাকা উচিত।

২. বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ: আমাদের (হিন্দুদের) উচিত মুসলিম মহিলাদের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে তাদের ধর্ষণ করা।

৩. উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব:
ছেলেরা তো ছেলে। অমন ভুল করে থাকে। আরে বন্ধুত্ব চলে গেলেই মেয়েরা ছেলেদের ওপর ধর্ষণের অভিযোগ আনে!

৪. মুম্বই-এর পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিং:
পঠনপাঠনের মধ্যে সেক্স এডুকেশন ঢোকানোর ফলে দেশে মহিলাদের প্রতি অপরাধ বাড়ছে।

৫. পুরীর শঙ্করাচার্য:
এককালে ভাইবোনেরা এক সঙ্গে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটত না। এখন মানুষের আবেগ, আদর্শ সবকিছুই বদলে গেছে। আমাদের সংস্কৃতি আমাদের শেখায় মহিলাদের সম্মান করতে—যে নারীরা আমাদের মা, বোন। এমন ভয়ানক ঘটনা (দিল্লিকাণ্ড) নিশ্চয় একদিনে ঘটে না। মানুষ উন্নয়ন ও আধুনিকতার নামে সভ্যতা-সংস্কৃতির সংকীর্ণ রেখাটিকে অতিক্রম করে বলেই ঘটে।

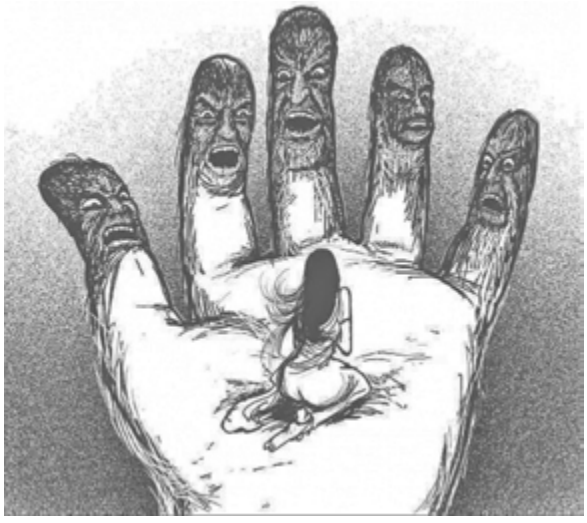

৬. মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বাবুলাল গৌর:
পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মহিলারা জিন্স-টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, পুরুষদের সঙ্গে নাচানাচি করে, মদ খায়—সেটা তাদের কালচার। ওসব ওই দেশে চলে, এ দেশে নয়। এখানে এখানকার রীতিনীতি মেনে চলাই ভালো।

৭. গোয়ার এমএলএ বিষ্ণু বাঘ:
যদি মডেলরাও এসে পার্লামেন্টে যোগ দিতে থাকে তাহলে তো গোটা পার্লামেন্ট-এই ফ্যাশন শো বসে যাবে! মালাইকা অরোরা, রাখি সাওন্ত-এর মতো ফ্যাশন দুনিয়ার মহিলারা ভোটে জিতে পার্লামেন্টে ঢুকে পড়লে দেশে দাঙ্গাও বেঁধে যেতে পারে।

৮. সমাজবাদী পার্টির এমএলএ আবু আজমি:
অবিবাহিত নারী পুরুষদের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে আইনত অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে গ্রামীণ ভারতে শহুরে দেশের তুলনায় ধর্ষণের ঘটনা অনেক কম ঘটত।

৯. স্বঘোষিত ঈশ্বরের দূত আশারাম বাপু:
শুধুমাত্র পাঁচ-ছ-জনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ধর্ষিতা ও ধর্ষণকারী উভয়েই সমান অপরাধী। আক্রান্ত হওয়ার আগে মেয়েটির উচিত ছিল ধর্ষণকারীদের ভাই বলে ডাকা এবং করুণা ভিক্ষা করা। এটা তার সম্মান ও জীবনকে রক্ষা করতে পারত। এক হাতে কি তালি বাজে? বাজে না বোধ হয়।

১০. জামাত-ই-ইসলামি-হিন্দ:
কো-এডুকেশন সিস্টেম বন্ধ হওয়া উচিত এবং মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে সমস্ত স্তরে শিক্ষার সুযোগ তৈরি হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পরিশীলিত পোশাক চালু করা উচিত।

১১. বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রেসিডেন্ট অশোক সিংহল:
ব্রিটিশ আমলের আগে মহিলাদের সতীত্ব অটুট থাকত। এই মডেলদের জন্যই এখন তা বিঘ্নিত হয়ে গেছে।

১২. ছত্তিশগড় মহিলা কমিশনের চেয়ার-পার্সন বিভা রাও: মহিলারা শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষদের অপ্রীতিকর ক্রিয়াকলাপে প্রলুব্ধ করে। মেয়েরা বুঝতে পারছে না কি ধরনের বার্তা তারা সমাজের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

১৩. বিএসপি নেতা রাজপাল সৈনি:
মহিলা ও শিশুদের হাতে ফোন দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ফোন তাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে। আমার মা, স্ত্রী, বোন সকলেই তো ফোন ছাড়া দিব্যি কাটিয়েছে।

১৪. খাপ পঞ্চায়েত নেতা জিতেন্দ্র ছাতার:
দারিদ্র্য, নেশাগ্রস্ততা বা যুব সমাজের খারাপ মেলামেশা ধর্ষণের মূল কারণ। তবে চাউমিন খেলেও হরমোনের সমস্যা দেখা দেয় যা ধর্ষণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

১৫. হরিয়ানার খাপ পঞ্চায়েত সদস্য সুবে সিং:
আমার মনে হয় মহিলাদের ১৬ বছর বয়সে বিয়ে করে নেওয়া উচিত যাতে স্বামীরা তাদের যৌন চাহিদা মেটাতে পারে। এর ফলে তাদের আর অন্য পুরুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এভাবেই ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব।

১৬. কংগ্রেসের এমপি সঞ্জয় নিরুপম, স্মৃতি ইরানীর উদ্দেশ্যে:
কাল পর্যন্ত পয়সার জন্য টিভিতে নাচ দেখাত, আর আজ ভোট বিশ্লেষক হয়ে গেল!

১৭. বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনী, মহিলাদের উদ্দেশ্যে:
যেখানে ইচ্ছে হয় বেরিয়ে পড়বেন না। যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। আক্রান্ত হতে পারেন। ভগবান কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বাঁচাতে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তো ততখানি আধ্যাত্মিক নই যে ঈশ্বর আমাদেরও বাঁচাবেন।

১৮. সিপিএম-এর এমপি অনিল বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি:
তৃণমূলের ভোটের খরচের জন্য উনি কোন ভাতারের কাছ থেকে ২৪ কোটি টাকা নিয়েছিলেন?

১৯. তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার:
পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা ধর্ষণের কোনো ঘটনাই নয়। ওই মহিলার ও তাঁর খদ্দেরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জের।

২০. বৈবাহিক ধর্ষণকে আইনত অপরাধ স্বীকারের মাধ্যমে বিলটিকে সংশোধনের জন্য ডিএমকে-র এমপি কানিমোজির চিঠির উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হরিভাই পারাথিভাই চৌধুরীর বক্তব্য:

অশিক্ষা, বিবিধ সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিবাহ একটি পুণ্য বিষয়।

হ্যাপি নিউ ইয়ার

চলতি বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বহু প্রতীক্ষিত রাজীব দাস হত্যা মামলার ফল ঘোষণা হল। দিদি রিঙ্কু দাস-কে শ্লীলতাহানি, বেআইনি অস্ত্র রাখা, এবং দিদিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা ষোলো বছর বয়সি রাজীবকে গুণে গুণে সতেরো বার ছুরির আঘাতে খুন করার অপরাধে মিঠুন দাস, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ও মনোজিত বিশ্বাস-কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল আদালত, মূল ঘটনার ঠিক চার বছর পর। কেস রিপোর্টেড না হওয়ার ফলে বা হলেও প্রমাণের অভাবে কিংবা প্রশাসনিক ঔদাসীন্যের কারণে পুরো ব্যাপারটাই ধামা চাপা পড়ে যাওয়ায় ধর্ষকদের একটা বড়ো অংশের কলার তুলে ঘুরে বেড়ানোর আধিক্যে, এ হেন দু-চারটে দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত যে কিছুটা হলেও আমাদের পুনরুজ্জীবিত করে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে একটা কেসের সুরাহা হতে না হতেই ঘটে যায় আরও একগুচ্ছ ঘটনা।

বছর পড়তে না পড়তে গোটা দেশ জুড়ে আরও কিছু ধর্ষণের খবর। ১. ২৬ ফেব্রুয়ারি এআইআইএমএস-এর জনৈক ডাক্তারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ দিল্লিতে পঁচিশ বছর বয়সি সিকিম নিবাসী একটি মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ২. উত্তর প্রদেশের মোতিপুরওয়া গ্রামে ১৬ বছরের একটি দলিত-কন্যার ধর্ষিত মৃতদেহ পাওয়া গেল গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায়। ভিকটিমের বাবার অনুমান, ওই গ্রামেরই দু-জন যুবক তার মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করে। ৩. মহারাষ্ট্রের লোনাভালার একটি রিসর্টে সাত বছরের শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেল, মেয়েটি নিখোঁজ থাকার দু-দিন পর। আংশিক অন্ধত্বে আক্রান্ত এই শিশুটি গিয়েছিল আত্মীয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। ৪. উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে একই সঙ্গে দুই শিশু কন্যাকে (পরস্পর তুতো বোন) ধর্ষণ করে পাড়ারই এক বছর পঞ্চাশেকের প্রৌঢ়। ৫. কলকাতায় বিজেপি-র পার্টি অফিসে একটি পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সতেরো বছর বয়সি জনৈক যুবককে। ৬. হরিয়ানার রোহতক গ্রামের গণধর্ষণ কাণ্ড—একটি আঠাশ বছর বয়সি মেয়ে তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায় যখন তার দু-টো হাত, বেশ কিছু অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ও শরীরের বাঁ-দিকটা পশুতে খেয়ে গেছে। মেয়েটির দেহে লাঠি ও পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রবল মারধর করে অচেতনও করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আটজন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবং নবম ব্যক্তিকে খোঁজা হচ্ছে। ৭. দিল্লির নিজামুদ্দিনে একটি স্কুলের বত্রিশ বছর বয়সি এক ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ছয় বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। ৮. পুরুলিয়ার জনৈক স্কুল-বাস ড্রাইভারকে, চার বছরের একটি শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ৯. জয়পুরে উনিশ বছর বয়সি একটি জাপানি মহিলা-পর্যটককে ধর্ষণ করে চব্বিশ বছরের যুবক। অপরাধ স্বীকার করার পর সাতজন বন্ধুর সহায়তায় সে শহর ছেড়ে পালায়। অবশেষে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পুলিশ, এবং দোষীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ১০. মালদা জেলার কালিয়াচকে ন-বছরের একটি শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করে তেত্রিশ বছরের যুবক। ১১. মার্চ মাসের মধ্যরাতে রানাঘাটের একটি কনভেন্ট স্কুলে বাহাত্তর বছরের জনৈক সিস্টারকে গণধর্ষণ করা হয়। ঘটনায় আরও তিনজন সিস্টার দুষ্কৃতীদের দ্বারা গুরুতর আহত হয়েছিল। এবং, রানাঘাটের কাণ্ডের দিনই, এন্সেফেলাইটিস-এ মারা গেল লড়াকু মেয়ে সুজেট জর্ডন, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্ক স্ট্রিটে ঘটে যাওয়া বহুচর্চিত ও বিতর্কিত গণধর্ষণ কাণ্ডের সেই ভিকটিম, দুই শিশুকন্যা ও অসমাপ্ত 'কেস'-কে পিছনে রেখে। ১২. সম্প্রতি, মে মাসে, আর জি কর হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই ২৪ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হাসপাতালে কর্তব্যরত দু-জন লিফটম্যান।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে, দেশে প্রতিদিন গড়ে বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই জন মহিলা ধর্ষিত হয়ে চলেছে। এবং চুরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভিকটিমের পূর্বপরিচিত।

ধর্ষণ ও ধন-তন্ত্র

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো ১৯৭১ সাল থেকে ধর্ষণের খতিয়ান নথিভুক্ত করতে শুরু করে। জানা যাচ্ছে, সে বছর রিপোর্টেড রেপ কেসের সংখ্যা ছিল ২৪৮৭। আইপিসি-৩৭৬ ধারায় ২০১৩ সালে দেশের সব ক-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে রিপোর্টেড রেপ কেসের সংখ্যা ৩৩৭০৭। ২০১২-র রিপোর্টেড রেপ কেসের সাপেক্ষে এই সংখ্যা ৩৫.২ শতাংশ বেশি। আবার গত ১০ বছরের খতিয়ান দেখলে জানা যায়, ২০০৩ থেকে ২০১৩-এ রিপোর্টেড রেপ কেসের শতাংশের হার বেড়েছে ৯১.৮। এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা যায়, এক—সত্যিই ধর্ষণের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দুই—ধর্ষণের হার যা ছিল তাই আছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বা সোশ্যাল স্টিগমাগুলোকে অতিক্রম করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর প্রবণতা বাড়ছে। 'স্লাট শেমিং অ্যান্ড ভিকটিম ব্লেমিং', মানে ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন আসলে তো মেয়েটি মাঝরাত্তিরে একা বেরিয়েছিল, আসলে তো মহিলার পোশাক বড্ড বেশি খোলামেলা ছিল কিংবা আসলে তো ও মেয়ে নয় 'মেয়েছেলে' —এইসব মিথ ভেঙে প্রতিবাদ জানাতে সক্ষম হচ্ছে বহু মহিলাই। ২০১৩ সালে দেশে রিপোর্টেড ইনসেস্ট রেপ কেসের সংখ্যা ছিল ৫৩৬ ও আক্রান্তের

সংখ্যা ৫৪৮। ইনসেস্ট রেপের ক্ষেত্রেও আশির দশকে বাড়ির ছোটো বৌমাকে শাশুড়ি যেমনটা বোঝাতে সমর্থ হতেন—আহা নিজেরই তো শ্বশুরমশাই, অমন হয়ে থাকে, তুমি বাপু পাঁচকান কোরো না—মেয়েরা কিছুটা হলেও এখন ক্রমে ক্রমে উপেক্ষা করতে চাইছে বা পারছে এইসব পরোক্ষ হুমকিকে। তবে, একটা ধর্ষণ ঘটে যাওয়ার পর ধর্ষকের শাস্তি যতটা জরুরি, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ধর্ষণের উৎসগুলোকে খুঁড়ে বার করা। ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাসের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থার ঘটনা আটকানোর থেকে অধিক কার্যকরী সার্বিক সচেতনতার বোধ তৈরি করা। বহু ক্ষেত্রেই ছোটোবেলা থেকে মেয়ে ও ছেলেদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা শুরু করানোর বা আলাদা পরিবেশে বড়ো করার ফলে শিশুমনে একটা অদ্ভুত ধারণা পুষ্ট হতে থাকে যে মেয়েরা ভিনগ্রহের জীব। তাদের প্রত্যঙ্গের বেড়ে ও গড়ে ওঠা ছেলেদের থেকে বিলকুল আলাদা এবং আশ্চর্য এক রহস্যের জালে আবৃত। বয়ঃসন্ধিতে সেই কৌতূহল আরও চরমে পৌঁছোয়। বাড়ির কিশোরটি যুবতী বুয়ার পাতিয়ালায় রক্তের ছিটে দেখে বিচলিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মধ্য-চিত্তের পরিবারেই তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে কেউ বোঝাতে আসে না, এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা, ঠিক যেমনটা ওই নাইট ফলস-ও। বোঝালে, অপরাধবোধ ও অপরাধের প্রবণতা কমত বই বাড়ত না। নারী-পুরুষ—ভিন্নলিঙ্গ, বহিরঙ্গে পৃথক, শারীরবৃত্তীয় কারণে আলাদা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে সেসব ডিসক্রিমিনেশন-কে অতিক্রম করা উচিত, এই বোধটা মানবিক বিকাশের একেবারে শুরু থেকে কোথাও মাথার ভেতর রোপণ করা দরকার। প্রশ্ন উঠতেই পারে, মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্তগ্রামে কো-এডুকেশন কালচার এবং অত্যাবশ্যক সেক্স এডুকেশন একটি ষোলো বছরের মেয়েকে স্কুলমুখী করে তোলার পক্ষে পরিপন্থী হয়ে উঠবে না কি? বলা বাহুল্য এ পরিবর্তনও একদিনে ঘটবে না। কিন্তু সর্বাগ্রে তো প্রতীত হতে হবে শিক্ষার কান্ডারিদেরও, যারা বদলটা আনতে পারবেন।

২০১৩-র রিপোর্টে, রিপোর্টেড রেপ কেসের সংখ্যা ৩৩৭০৭ হলেও ভিকটিমের সংখ্যা কিন্তু ৩৩৭৬৪। এই পরিসংখ্যানকে বয়সের নিরিখে ভাগ করে দেখা গেছে: ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ১৫৮৪; ১০-এর বেশি বয়স থেকে ১৪ বছরের মধ্যে ২৮৪৩; ১৪-র বেশি বয়স থেকে ১৮ পর্যন্ত ৮৮৭৭; ১৮-র অধিক থেকে ৩০ অবধি ১৫৫৫৬; ৩০-এর বেশি থেকে ৫০ পর্যন্ত ৪৬৪৮; ৫০-এর ঊর্ধ্বে ২৫৬। স্পষ্টতই ১৮ থেকে ৩০ এই বয়সকালকে রিপোর্টের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল ধরা যেতে পারে। কারণটা বোধ করি এই যে, ভারতীয় (অপ) সংস্কৃতিতে যৌবনের কনসেপ্ট মূলত এই বয়সের পরিসরে সীমাবদ্ধ। গয়নার বিজ্ঞাপনে কচি মেয়েটি যেমন মায়ের চুড়ি হাতে গলিয়ে রমণী হয়ে উঠতে চায়, তেমনই মধ্যবয়সি নারীকে সাবান মাখিয়ে বয়স কমানোর চেষ্টা চালানো হয় এবং স্তাবকের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে—আপকো দেখকে তো উমর কা পাতা হি নহি চলতা। একটা বড়ো সংখ্যক মূল ধারার ঝিনচ্যাক দিশি ছবিতে নায়িকার বয়স কিছুতেই তেইশের বেশি হয় না। গোটা বিপণনের দুনিয়া যৌবন বেচতে বদ্ধপরিকর। এবং যারা খাচ্ছে তাদের কাছে 'পূর্ণ যৌবনা' নারীকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য হিসেবে পরিবেশন করার অদম্য প্রয়াস। ফলত এরাই 'টার্গেট'। আর উন্নয়নশীল দেশে পূর্বোল্লিখিত কনসেপ্ট-এর সঙ্গে ভার্জিনিটি-র পাঞ্চ মিশিয়ে দিলে ১৪ থেকে ১৮-র ভীতিপ্রদ সংখ্যার ব্যাখ্যাটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১২-এর দিল্লি কাণ্ড সমাজের পক্ষে একটা কালো দিক হলেও ধর্ষণের সংজ্ঞায় তা কিছুটা আলো দেখাতে পারল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জাস্টিস জে.এস ভার্মা-র তত্ত্বাবধানে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তে ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আইপিসি-৩৭৫ ধারায় বেশ কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগল। জানলাম, ধর্ষণ শব্দটা শুধুমাত্র যোনি ও লিঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার বিষয় নয়। আরও কিছু বয়সসীমা ও শর্তের তারতম্য ঘটানো হল পরিমার্জিত সংজ্ঞায়। তবে ম্যারিটাল রেপ এই ধারাতেও অপরাধ হিসেবে গণ্য হল না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র ২০১২-র রিপোর্টে আমরা দেখেছি দেশে মোট ১০৬৫২৭ জন মহিলা গৃহনির্যাতন (আইপিসি ৪৯৮ এ)-এর শিকার। এখানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়তে অর্থাৎ ত্রিপুরার পরেই। যেখানে ডোমেসটিক ভায়োলেন্স-এর পরিসংখ্যান এ হেন, সেখানে বৈবাহিক ধর্ষণের সংখ্যাও যে বিপুল হবে তা সহজেই অনুমেয়।

যৌনাচারে নারীটি নিয়ন্ত্রিত হবে তার পুরুষটির দ্বারা, এই মিথ-এর কারণেই বোধ করি ম্যারিটাল রেপ-কে শুধুমাত্র 'রাফ সেক্স' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার একটা কালচার আগেও ছিল এবং এখনও আছে। না হলে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত পুরুষতান্ত্রিক পরিবার-পরিকাঠামোর সুখী সুখী ইমেজ ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা থেকে যায়। ১৯৭৫ সালে কেমব্রিজ ডকুমেন্টারি ফিল্মস-এর জন্য মার্গারেট লাজারাস ও রেনার উন্ডারলিচ 'রেপ কালচার' নামে একটি তথ্যচিত্র বানান যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই ধর্ষণ করার যে প্রবণতা তাকে 'স্বাভাবিক' বলার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়। ছবিটা ধর্ষণের ধারণাকে প্রথম সংজ্ঞায়িত করার স্বীকৃতি পায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে এর ঠিক ত্রিশ বছর পরে, ২০০৫ সালে ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মাতৃভূমি' ছবিটির কথাও যা একইসঙ্গে ফিমেল ফিটিসাইড, ডাওরি, ম্যারিটাল রেপ, ইনসেস্ট রেপ ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। মোদ্দা কথাটা হল উৎস যাই হোক না কেন, আর্থসামাজিক সমস্যা, জাতিবিদ্বেষ, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্মীয় ভেদভাব, হোমোফোবিয়া, যুদ্ধ পরিস্থিতি, পর্নোগ্রাফি, মানসিক বিকার ইত্যাদি প্রভৃতি, মূল লক্ষ্য কিন্তু আঘাত করার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা প্রদর্শন। পাওয়ার এক্সারশন। বীরভোগ্যা পৃথিবী ও রূপমুগ্ধা নারী—এই কনসেপ্ট থেকে যেমন একজন বলশালী রাজা ভূমি দখল করার পর জমিতে তলোয়ার পুঁতে জাহির করত ওই পরিসরের ওপর তার কর্তৃত্ব, একজন পুরুষও নারীর মুখ, যোনি, পায়ু অথবা শরীরের যেকোনো ছিদ্রে লিঙ্গ বা অন্য কোনো বস্তুর প্রবেশ ঘটিয়ে তার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করায়। পেনিট্রেশন—মাটি হোক বা রমণী, গ্রোথিত করার মাধ্যমে তার ওপর ক্ষমতাশালীর অধিকার প্রয়োগ। অথচ শুধু ধর্ষণ কেন, আমরা যাকে স্বাভাবিক যৌনাচার বলে জানি, সেখানেও এই পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতাপ্রদর্শনের রাজনীতি। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নততর গবেষণা জানায়, নারীর অরগ্যাজম 'কেবলমাত্র' পেনিট্রেশনকেন্দ্রিক —এটাও স্রেফ একটা মিথ!

সাম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে যে একক ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গণধর্ষণের ঘটনাও অনেক বেশি ঘটছে। গবেষণা বলছে এর পেছনে

কারণগুলো মূলত যৌনতার অধিকারপ্রয়োগ, বিনোদন ও শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা। একজন পুরুষ এককভাবে ধর্ষণ করাকালীন যতখানি বলপ্রয়োগ করতে সক্ষম, দলবদ্ধ অবস্থায় তার আঘাত করার ক্ষমতা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনজন বা তার বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করে যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বয়সে তরুণ। বলা বাহুল্য, এ বিষয়টি অনেক বেশি হিংসাত্মক এবং যৌন অত্যাচারের পাশাপাশি অযৌন অত্যাচারও করা হয় ভিকটিমকে। যুদ্ধ বা দাঙ্গার পরিস্থিতিতে মহিলাদের গণধর্ষণের মাধ্যমে ভিকটিম ও তার কম্যুনিটিকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যাপক হারে গণধর্ষণের প্রবণতা দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। তবে সাধারণভাবে, যুবসমাজের বেকারত্ব আর নেশাগ্রস্ততাকে গণধর্ষণের বড়ো কারণ বলে দাবি করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। আর যারা গণধর্ষিত হচ্ছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের সদস্য। কেননা সামাজিক কারণেই তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও সাহস বহুলাংশে কম। আমাদের দেশে এখনও আলাদা করে গণধর্ষণের রেকর্ড সংগ্রহ করা হয় না। হলে দেখা যাবে সার্বিক পরিস্থিতির মতোই গণধর্ষণের ঘটনাও ক্রমবর্ধমান।

না-ফুরোনো গল্পগুলো

বড়ো বেদনার বোধও ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে। মেয়েটির স্বজনেরা, এমনকী সে নিজেও শরীর-মনের ক্ষতগুলোর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। আর আমরা যারা খবর কাগজের পাতায় ঘটনার বিবরণ পড়লাম, দু-চারদিন ভেতরে ভেতরে কোথাও আগুনটুকু জ্বলল, তারাও দ্রুত ফিরে যেতে চাই পরিচিত স্বাভাবিকতায়। টানা বিয়াল্লিশটা বছর ভেজিটেটিভ স্টেটে অরুণা শানবাগ পড়ে ছিল হাসপাতালের বিছানাতে। ১৯৭৩ সালের ২৭ নভেম্বর সোহনলাল বাল্মীকি নামে সরকারি হাসপাতালের এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পঁচিশ বছর বয়সি একটি নার্সকে গলায় কুকুরের চেন বেঁধে সোডোমি অর্থাৎ পায়ুছিদ্র দিয়ে ধর্ষণ করে। সেই নার্স, মানে অরুণার মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, ব্রেন স্টেম ও সারভাইকাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কর্টিকাল ব্লাইন্ডনেস ঘটে। সোহনলালের কেবল সাত বছরের হাজতবাস হয় 'ডাকাতি ও খুনের চেষ্টার অপরাধে', কেননা আইপিসি-৩৭৬ অনুযায়ী সোডোমি-র মাধ্যমে ধর্ষণকে তখন ধর্ষণ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত না। গত ১৮ মে ২০১৫ অরুণা 'মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'। যদিও অরুণার অস্তিত্বের, চেতনার, মৃত্যু ঘটেছিল বহুবছর আগেই। ৪২ বছর ধরে 'জীবন্মৃত' অরুণাকে তাঁর সহকর্মীরা পরম মমতায় পরিচর্যা করে গেছেন—এতটাই যে এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর একটিও বেডসোর হয়নি। সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও 'অরুণা'জ স্টোরি'-র লেখক পিঙ্কি বিরানি চেয়েছিলেন অরুণার শরীরী-মৃত্যু। কিন্তু অরুণার সহকর্মীরা তাতে কান দেননি। অরুণার মৃত্যু হল আর সোহনলাল মাত্র ৭ বছর জেল খেটে স্বাধীন জীবনযাপন করছে।

বিহারের দেওঘর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে পারারিয়া গ্রামে এক রাতে উনিশজন আদিবাসী মহিলা ধর্ষিত হয়। নিমিয়া, রাধিয়া, দারিয়া, সুমিয়া ও ভগবতিয়া, পারারিয়া গণধর্ষণ কাণ্ডে (১৯৮৮) মাত্র এই পাঁচজন ছিল অভিযোগকারী। যে ষোলোজনের বিরুদ্ধে কোর্টে যায় এই মহিলারা, তারা সকলেই ছিল পুলিশকর্মী, চৌকিদার ও হোমগার্ড। ধর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মারধর ও তাদের বাড়িতে লুঠতরাজও চলে। অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও ধর্ষিতদের যথাযথ মেডিক্যাল পরীক্ষা হয় না। সরকারি পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এবং পরবর্তীকালে ওই পাঁচজন মহিলাকে প্রতারক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়, মিথ্যাচারের জন্য এরা যেকোনো কিছু করতে পারে কারণ হাজার টাকা এদের কাছে সত্যিই অনেক।

২০০২-এর গুজরাত দাঙ্গায় অসংখ্য মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় যার হিসাব কেউ দেয়নি আজ পর্যন্ত।

২০০৩ সালে একজন আঠাশ বছর বয়সি সুইস ডিপ্লোম্যাট-কে তার নিজের গাড়িতে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষিত তার বিবৃতিতে বলে—ধর্ষকদের একজন অনর্গল ইংরিজিতে কথা বলে যাচ্ছিল। এমনকী তাকে প্রশ্ন করছিল সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে, আর সম্ভবত ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তাকে জ্ঞানও দিচ্ছিল।

মণিপুরের বত্রিশ বছর বয়সি মেয়ে মনোরমাকে আসামের সৈন্যরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় 'রাষ্ট্রদ্রোহীদের' সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে। কয়েক ঘণ্টা পর তার বিক্ষত শরীর পাওয়া যায়। মনোরমার তলপেট ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য বুলেটের আঘাতে। সালটা ২০০৪।

২০০৯ সালে ভারত-শাসিত কাশ্মীরের সোপিয়ান টাউনে দু-টি তরুণীকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। প্রতিবাদে টানা সাতচল্লিশ দিন সশস্ত্র আন্দোলন ও ধর্মঘট চলে।

মাওবাদীদের সংবাদপ্রেরক সন্দেহে ২০১১-র অক্টোবর পর্যন্ত সোনি সোরি-কে ছত্তিশগড়ের জেলে আটকে রাখা হয়। জেল থেকে বেরোনোর পর সোনি সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানায়, বন্দি থাকাকালীন তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছিল ও তার যোনিপথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাথর।

২০১২ সালে উত্তর প্রদেশের একটি থানার ভেতরে সোনম নামে চোদ্দ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

২০১৩ সালে কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে কামদুনি গ্রামে কুড়ি বছর বয়সি কলেজ পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়। ন-জন অভিযুক্তের মধ্যে আটজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আপাতত তদন্তের ভার সিবিআই-এর হাতে। ভিকটিমের পরিবার ও বন্ধুরা বিচারের অপেক্ষায়।

এমন আরও অনেক জানা-অজানা ঘটনা নিয়ত ঘটে চলেছে চারপাশে। তার কতগুলো কেস রিপোর্টেড হচ্ছে? ঠিক কতগুলো ঘটনার মীমাংসা হচ্ছে? কতজন অভিযুক্ত শাস্তি পাচ্ছে? 'তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ'—এর চক্করে একাধিক প্রমাণ লোপাট হয়ে যাবে। উচ্চবংশের ছেলে দলিতের মেয়েকে ধর্ষণ করে না—এমন হাস্যকর কিছু যুক্তি সাজিয়ে বেমালুম ছাড়া পেয়ে যাবে ধর্ষক। অমুক যখন শাস্তি পেল না তখন আমাদেরই বা কে কী করবে—এমন মনোবল নিয়ে ধর্ষণে উদ্যত হবে আরও আরও ধর্ষক। ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে ভিকটিম ও তার পরিবারের। কোনো কোনো ধর্ষিত অর্থের বিনিময়ে কন্যা সন্তানের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে চাইবে। অন্তত এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই চাওয়াটুকু জাস্টিফায়েড। আর যাদের হাতে ভুবনের ভার, দেখাই যাচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের একটা বড়ো অংশ চরম পুরুষতান্ত্রিকতা, ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত অশিক্ষার শিকার। রিপোর্টের ভিত্তিতে

সামাজিক অবক্ষয়ের কাটাছেঁড়া চলবে, চলবে সামাজিক অবক্ষয়ের ভিত্তিতে রিপোর্টের কাটাছেঁড়াও। বয়স উনিশ লিখে যে পনেরো বছরের মেয়েটিকে শহর কলকাতা থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরে বিয়ে দিয়ে দিল তার মা-বাবা, ইনসেস্ট রেপের খতিয়ানে তার বয়স কিন্তু রইল উনিশই। ১৮ থেকে ৩০-এর এই লম্বা ঘরটিকে কেন ১৮ থেকে ২৪ এবং ২৪ থেকে ৩০-এ ভাগ করা হল না, প্রশ্ন থেকে যাবে। জানা হবে না, আঠেরো বছরের কমবয়সি একটি ছেলে যদি গণধর্ষণে শামিল হয় এবং পূর্ণাঙ্গ ধর্ষণে সক্ষম হয় তাহলে শাস্তি ঘোষণার সময় তাকে কেন দেখা হবে একজন নাবালক হিসেবেই? এক্ষণে প্রশ্ন উঠবে সাবালকত্বের মাপকাঠি, ভোটাধিকার, মদ্যপান, বিবাহের বয়স এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নানাবিধ মাইলস্টোন নিয়েও। বরং আজ থাক। উত্তর খোঁজা যাবে অন্য কোথাও . . . অন্য কোনোখানে . . . □

ডা. অবন্তিকা পাল আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, প্রাবন্ধিক।

With Best Compliment from

S. S. Health Care

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে **মেয়েদের ভুবন**

অজস্র অরুণার মৃত্যুর পরেও নির্ভয়া

অরুণা, মথুরা, ভাঁওরি দেবী হয়ে নির্ভয়া, অপরাজিতা—একের পর নারীর ধর্ষণ রাষ্ট্রের বুকের উপর চলতেই থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে নারী শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সুতরাং তাকে বলপূর্বক দখল করাই এই সমাজের লক্ষ্য। এক-একটা ঘটনা ঘটে, আন্দোলন হয়, রাষ্ট্রশক্তি কিছু নতুন আইন করে বা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখার মনোভাবের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় না—সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে লিখছেন **মিতালী**।

সংবিধান অনুযায়ী আইনের চোখে সব নাগরিকের সমান অধিকার। সেখানে বলা আছে রাষ্ট্র নারী পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য রাখবে না। কিন্তু নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজ করছে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই। পরিবারের ভিতরে বাইরে নারীর মতামতের কোনো অধিকার নেই। তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া যৌনহিংসার একমাত্র সাক্ষী তিনিই, কিন্তু তাঁর ন্যায় বিচার নির্ভর করে সরকারি পুলিশ, উকিল, বিচারকের উপর। এঁরা প্রত্যেকেই শ্রেণিগত ও জাতপাতের বৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে সযত্নে লালন করে আসছেন। ফলে অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায় আর নির্যাতিতাকে লুকিয়ে বেঁচে থাকতে হয় নাম পরিবর্তন করে। অবশ্যম্ভাবীরূপে ধর্ষণের কারণ হিসেবে চিত্রিত হয় তাঁর নিজেরই চরিত্র।

কিন্তু কিছু কি বদলাচ্ছে? বদলালে, কী বদলাচ্ছে? কতটুকু বদলাচ্ছে? আচ্ছা, দেখি কয়েকটা অল্প পুরোনো আর কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের কী বলতে চাইছে।

মথুরা—আইনরক্ষকের হাতে বলাৎকার

১৯৭২ সালে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাবার অভিযোগে ১৬ বছরের আদিবাসী মেয়ে মথুরাকে মহারাষ্ট্রর চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে আসেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। প্রশ্ন করার ছলে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে দু-জন পুলিশকর্মী মথুরাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু সেশন আদালতে পুলিশদের কোনো সাজা হয় না। কারণ? 'টু ফিঙ্গার টেস্ট'-এ দেখা যায় মথুরার যৌন সঙ্গমের অতীত অভিজ্ঞতা ছিল। এর সঙ্গে মথুরার গায়ে কোনো আঘাত, আঁচড় ইত্যাদি না থাকায় ধরে নেওয়া হয় তাঁর শারীরিক মিলনে সম্মতি ছিল, সুতরাং এটি ধর্ষণ নয়। টু ফিঙ্গার টেস্টটি নারীর পক্ষে খুবই অবমাননাকর। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই, কারণ সতীচ্ছদের গঠন সবার সমান হয় না, আর নানা কারণেই নারীর সতীচ্ছদ ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল, কোনো নারীর সতীচ্ছদ ছেঁড়া, এ দিয়ে যদি ধরেই নিই যে তাঁর জীবনে যৌন সঙ্গম ঘটেছে, তার সঙ্গে ধর্ষণের কী সম্পর্ক? কোনো নারীর জীবনে যৌন সঙ্গম অতীতে ঘটে থাকলেই তাঁর সঙ্গে জোরজার করে যথেচ্ছ যৌন সঙ্গম করার অধিকার কোনো পুরুষের বা পুলিশকর্মীর জন্মে যায় নাকি?

মথুরা কেসে সেশন কোর্টের রায়কে নাকচ করে মুম্বাই হাইকোর্ট রায় দেয়—ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করা ও স্বেচ্ছায় সম্মতি দেওয়া দু-টো এক নয়, এবং দোষীদের ন্যূনতম শাস্তি ঘোষণা হয়। কিন্তু তারপর কেস যায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট যুক্তি দেয় মথুরা বাধা দেবার চেষ্টা করেননি, কোনো চেঁচামেচিও করেননি—তাই তাঁর সম্মতি ছিল এটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দোষীরা আবার মুক্তি পায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এটা দেখলেন না যে একটি জনজাতি পরিবারের ১৬ বছরের বালিকা যখন পুলিশের কাছে 'অপরাধী' হয়েই আসে, তখন তাঁর মনে কী পরিমাণ আতঙ্ক জমা হয়। তারপর বন্ধ ঘরে সেই আইনরক্ষকরা তাঁর ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন শরীর-মন আতঙ্কে অবশ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, বাধা দেওয়া তখন সম্ভবই নয়। যদি বা প্রাথমিকভাবে মথুরা বাধা দিয়েও থাকেন, তাঁকে মেরে ফেলার, বা সমাজের সবার সামনে হেনস্থা করার ভয় দেখালে তিনি চুপ করে যেতে পারেন। সেটাকে আর যাই হোক, 'স্বেচ্ছায় সম্মতি' বলে আখ্যায়িত করার কারণ ছিল না।

মথুরা মামলার রায় ঘোষণার পরে নারী সংগঠনগুলি প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। তার ফলে সরকার বাধ্য হয়ে অনেক পরে, ১৯৮৩ সালে, আইনি কিছু পরিবর্তন আনে তাতে বলা হয় কোনো নারী থানা, হাসপাতাল, কারাগার বা কোনো সরকারি সংস্থার হেফাজতে থাকাকালীন ধর্ষিত (custodial rape) হলে আদালত ধরে নেবে যে সেখানে নারীর কোনো সম্মতি ছিল না। এবং সেক্ষেত্রে ধর্ষকের কঠোর শাস্তি হবে। কিন্তু, আমি প্রথমেই যেমন বলেছি, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বদলায়নি; আর আইনরক্ষকদের ভূমিকা কত মহান সে তো দেখাই যাচ্ছে। ফলে এরকম শাস্তি দেবার দৃষ্টান্ত এদেশে এখনও, আইন লাগু হবার ৩০ বছরেরও পরেও, খুবই বিরল।

অরুণা শানবাগ—একটি প্রতীক

অনেক আশা এবং স্বপ্ন নিয়ে মুম্বাইয়ের কেইএম হাসপাতালে জুনিয়ার নার্স হয়ে এসেছিলেন অরুণা শানবাগ। ১৯৭৩ সালের ২৭ নভেম্বরের একটি ঘটনা তাঁর জীবনকে আমূল পালটে দিল। কাজ সেরে বেসমেন্টে পোশাক বদল করার সময় তাঁর ওপর চড়াও হয় হাসপাতালের সাফাই কর্মী সোহনলাল ভার্থা বাল্মিকী। গায়ের জোরে অরুণার গলায় কুকুর-বাঁধার চেন বেঁধে পায়ু সঙ্গম (সোডোমাইজ) করে ভার্থা। ১১ ঘণ্টা পর অরুণাকে বেসমেন্ট থেকে উদ্ধার করে তাঁর সহকর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ গলায় চেন বাঁধা অবস্থায় পরে থাকার ফলে অরুণার মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি লোপ পায়। পুরোপুরি কোমায় চলে যান অরুণা—ডাক্তারি ভাষায় যার নাম পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট। বাল্মীকী

যখন ধরা পরে তখন তার কাছ থেকে অরুণার কানের দুল উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তখন পুরুষাঙ্গ স্ত্রী-যৌনাঙ্গের ভেতরে প্রবেশ না করলে সেটি ধর্ষণ বলে গণ্য করা হত না। যেহেতু ধর্ষণের আইনি সংজ্ঞা মেনে যোনি-সঙ্গম হয়নি, এবং ফিঙ্গার টেস্টে যোনিচ্ছদ অক্ষত ছিল, তাই মহামান্য আদালত সোহনলালকে মাত্র ৭ বছরের জন্য হাজতবাসের হুকুম দেন। সেটা কিন্তু এই নির্মম ধর্ষণের জন্য নয়, খুনের প্রচেষ্টা ও কানের দুল চুরি করার অভিযোগে!

চিত্র ১. অরুণা শানবাগ (আগে)

৭ বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাল্মিকী ঘুরে বেরিয়েছে স্বাধীনভাবে আর ৪২ বছর ধরে মূক, বধির, প্যারালাইজড অরুণা পড়ে থেকেছেন বিছানায়। পরিবার, আত্মীয়স্বজন কেউ তাঁর খোঁজ রাখেনি। খিদে, তৃষ্ণা, আনন্দ-দুঃখ কোনো অনুভূতিই তাঁর ছিল না (ভাগ্যিস!), পাইপ ঢুকিয়ে খাওয়ানো হত। অরুণার এইভাবে 'বেঁচে থাকা' থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সাংবাদিক, সমাজকর্মী পিঙ্কি ভিরানি। অরুণার স্বেচ্ছা মৃত্যু চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ভিরানি। ২০১১-তে আদালতে স্বীকৃতি পায় প্যাসিভ ইউথ্যানেসিয়া আইন, অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত এমন কোনো রোগীর চিকিৎসা ধীরে ধীরে বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু অরুণার ক্ষেত্রে তাঁর দিনরাত সেবা করা নার্সরা চেয়েছিলেন তিনি বেঁচে থাকুন। এই নার্সদের সেলাম জানাতেই হয়। ৪২ বছর এইভাবে বেঁচেছিল অরুণার দেহ, কিন্তু তাঁর কোথাও একটা বেডসোর হয়নি, যেখানে দু-এক মাস বিছানায় পড়ে থাকলেই আকছার বেডসোর হচ্ছে এমনটাই আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অরুণার ইউথ্যানেসিয়া হয়নি। জড়পদার্থের মতো বেঁচে ছিলেন অরুণা। অবশেষে ৪২ বছর পরে, এই সেদিন ২০১৫ সালের ১৮ মে নিউমোনিয়ায় ভুগে তাঁর শারীরিক মৃত্যু হয়। অরুণার মৃত্যুতে আবার শিরোনামে উঠে আসে নারীর নিরাপত্তা ও ধর্ষকের শাস্তির প্রশ্ন। ধর্ষণ আইন নিয়ে আবার নানা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। কিন্তু সোহনলালদের কোনো শাস্তি হয় না।

শ্রেণিবৈষম্যের শিকার ভাঁওরি দেবী

শুধু ব্যক্তিপুরুষের ক্ষমতাই নয়, নারীর নির্যাতনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জাতপাত, ধর্ম শ্রেণি সম্প্রদায়গত সামাজিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জোরে ভাঁওরি দেবী থেকে বদায়ূঁর 'নীচু জাত'-এর নারীদের ধর্ষণ ও নিধন চলতেই থাকে।

নীচু জাত কুমার (কুমোর) মহিলা ভাঁওরি দেবী ছিলেন রাজস্থান সরকারের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির নারীকর্মী। উঁচুজাতের পুরুষ রামকরণ গুজ্জরের

চিত্র ২. অরুণা শানবাগ (মৃত্যুর আগে)

একবছরের কন্যা সন্তানের বিয়ের প্রতিবাদ করাতে ভাঁওরির পরিবারকে একঘরে করে দেওয়া হয়। তাঁদের তৈরি মাটির বাসনপত্র কেনা বন্ধ করে দেয় গ্রামের লোকজন। এইখানেই আক্রোশ মেটে না। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাঁওরি দেবী যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে খেতে কাজ করছিলেন তখন রামকরণ গুজ্জরসহ আর পাঁচজন ভাঁওরি দেবীর স্বামীর সামনে তাঁকে গণধর্ষণ করে। নিম্ন আদালত উঁচুজাত বলে দোষীদের মুক্ত করে দেয়। ভাঁওরি দেবী লড়াই ছাড়েননি। তিনি হাইকোর্টে মামলা করেন।

ভাঁওরি দেবীর সুবিচারের দাবিতে মহিলা সংগঠনগুলি একজোট হয়, ও 'বিশাখা' নামের আওতায় কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার ব্যাপারে কিছু নির্দেশিকার আবেদন করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। ১৯৯৭ সালে সেই মামলার রায় ঘোষণা হয়, তৈরি হয় 'বিশাখা নির্দেশিকা'। যার মূল বক্তব্য হল কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যাতে সুস্থ পরিবেশে কাজ করতে পারেন ও সেখানে তাঁদের প্রতি কোনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যৌন হেনস্থা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব কর্মরত সংস্থাকে নিতে হবে। ভাঁওরি দেবীর লড়াই আমাদের এনে দিয়েছে 'কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন'। কিন্তু তাঁর ধর্ষকদের আজও কোনো শাস্তি হয়নি। উপরন্তু দেখা যায় রাষ্ট্র এই ধর্ষণগুলিকে অনুমোদন দিয়ে যায়।

উত্তরপ্রদেশের বদায়ূঁতে দুই দলিত কন্যাকে গণধর্ষণ করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যেই বীরভূমে ভিন্নজাতের ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করার শাস্তি হিসেবে রীতিমতো সালিশি সভা করে মোড়লের নির্দেশেই ১২ জন গ্রামবাসী মিলে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে, আর সেটা খুব আগেকার ঘটনাও নয়।

নির্ভয়া ধর্ষণ ও সাম্প্রতিক লড়াই

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে আর এক বিভীষিকাময় রাতের বহুশ্রুত ঘটনা। দিল্লির প্যারামেডিক্যাল ছাত্রী জ্যোতি সিং বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখে ফেরার পথে চলন্ত বাসে নির্মম গণধর্ষণের শিকার হন। তাঁর যৌনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে চলন্ত বাস থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ধর্ষণের খবর ছড়িয়ে যাবার পর দিল্লির রাজপথে মানুষ ক্রোধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। নাম-না-জানা মুখ-না-দেখা জ্যোতি সিং-এর প্রতীকী নাম হয়ে ওঠে 'নির্ভয়া'। ১১ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে মৃত্যু হয় নির্ভয়ার। প্রবল শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে যুবক-যুবতীরা রাজপথ দখল নেয়। জলকামানের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে, নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। শুধু দিল্লিতে নয় সারা ভারতবর্ষে

ছড়িয়ে পরে এই আন্দোলন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতেও ওঠে প্রতিবাদের ঢেউ। বোধহয় এই প্রথম এই মাপের আন্দোলনে সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে—মুঝে চাহিয়ে আজাদী, বাপ সে ভি আজাদী, খাপ সে ভী আজাদী। বাধ্য হয়ে ধর্ষণ আইন পরিবর্তন করতে সরকার বাহাদুর গঠন করেন ভার্মা কমিটি, তৈরি হয় নতুন যৌনহিংসা আইন। যে আইন অনুযায়ী বলপূর্বক করে করা যেকোনো সঙ্গমই ধর্ষণ, সেটা আর পায়ু, মুখ আর যোনির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাতিল হয় টু ফিঙ্গার টেস্ট। বলা প্রাসঙ্গিক, ভার্মা কমিটির অনেক সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি। বৈবাহিক ধর্ষণ (স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর ধর্ষণ) এখনও আইনে ধর্ষণ বলে গণ্য হয় না, যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেব বলছে ভারতীয় বিবাহিত নারীর ৭৫ শতাংশ বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বৈবাহিক ধর্ষণ নাকি ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রযোজ্য নয়। বৈবাহিক ধর্ষণ কথাটা বলা মানেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে অগ্রাহ্য করা।

রাষ্ট্রীয় মদতে ধর্ষণ

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনেক আইন আছে, কিন্তু তাতে কী এসে গেল? ক-টা আইন কার্যকারী হয়? হেফাজতে ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও ২০১২ সালে ছত্তিশগড়ে শিক্ষিকা সোনি সোরিকে মাওবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে চলে নির্মম অত্যাচার। যে পুলিশ অফিসারের নির্দেশে তাঁর যৌনাঙ্গে ও পায়ুতে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেই অফিসার অঙ্কিত গর্গকেই পুরস্কৃত করে তখনকার কংগ্রেস সরকার। যে রাষ্ট্র ধর্ষককে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে, ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, মহিলা থানা চালু করে তার নারীদরদী চরিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, সেই রাষ্ট্রই সেনাবাহিনীর হাতে থাংযাম মনোরমার যৌনাঙ্গ বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হবার পর একজন সেনার বিরুদ্ধেও চার্জশিট দেয় না। মণিপুরের মানুষের উত্তাল আন্দোলনের পরও আফস্পা আইন বজায় রাখে, সেখানে সেনা-আধাসেনা বাহিনী ধর্ষণসহ অজস্র অপরাধ করলেও বিচার হবার কোনো পথই নেই। লালগড় নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রীয় শক্তি যৌথবাহিনীর বর্বর আক্রমণের শিকার শিবানি সিং, রাধারানী আড়ি-র ধর্ষকদের কোনো বিচার হয় না।

আসলে যতই আইন তৈরি হোক না কেন এই সমাজ-আইন-প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার দাম্ভিকতা। তাই আজও নারীকেই নানা তথ্য সহযোগে প্রমাণ করতে হয় যে সে সম্মতি দেয়নি। এবং সেই প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য যে নির্দেশিকা (medico-legal care) থানা, হাসপাতালগুলিকে মেনে চলতে হয় সেগুলি সম্পর্কেই তাঁরা ওয়াকিবহাল নন। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ধর্ষণ প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু নিজের ধর্ষণ প্রমাণ করতে গিয়ে নারীকে থানা, হাসপাতাল, কোর্টে নানা অপমানজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। নির্যাতিতার পক্ষ থেকে লড়াই করে যে সরকারি উকিল সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের তাঁবেদারি করে, ফলে সরকার মদতপুষ্ট, বা সরকারি দলের আশ্রিত ধর্ষকেরা নির্বিবাদে ছাড়া পেয়ে যায়। এমনকী যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করতে অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনুসন্ধান কমিটি রয়েছে সেখানে প্রায়শই আগে নারীর চরিত্রকেই প্রশ্নায়িত করা হয়।

ধর্ম, ঐতিহ্য ও নারীর ওপর দখলদারির অধিকার

যুগ যুগ ধরে চলে আসা মূল্যবোধ নারীকে শুধুমাত্র যৌনবস্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই দেখে এসেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, প্রভু রাম থেকে মনু, সবাই নারীর চরিত্রকেই লাঞ্ছিত করে এসেছেন। বর্তমানে তাদেরই পথ ধরে ধর্মগুরু থেকে রাজনৈতিক নেতার মুখেও সেই পুরুষতন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে নির্ভয়ার ধর্ষক রাম সিং আর আসারাম বাপু, জিতেন্দ্র ছাতার, বাবুলাল গৌড় প্রমুখ 'মহান' ব্যক্তিরা একই অবস্থান গ্রহণ করেন। এঁরা মনে করেন মেয়েদের পোশাক-চাওমিন খাওয়া-মোবাইল ফোন ব্যবহার—সবই ধর্ষণের কারণ। এঁদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী 'ইসলামিক স্টেট'-এর চিন্তাধারায় আপাতদৃষ্টিতে যতটা তফাত দেখা যায় ততটা তফাত বোধহয় নেই।

কথাটা যখন উঠলই তখন বলে রাখি, সন্ত্রাসবাদী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে 'ইসলামিক স্টেট' এখন বারবার আসছে। ইসলামের নাম করে, ধর্মগ্রন্থের নানা বচন উদ্ধৃত করে, এরা 'দখলে পাওয়া' নারীদের যৌন ক্রীতদাসী হিসেবে ভোগ করছে। উত্তর ইরাকের কয়েক হাজার ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের নারীকে এরা যৌথ বলাৎকার করছে মাসের পর মাস ধরে, এবং সেটাকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রচার করছে। অসংখ্য ধর্ষকের হাতে পড়ে বহু নারী পরস্পরকে আত্মহত্যায় সাহায্য করছেন। ন-বছরের বালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এইভাবেই 'ইসলামিক স্টেট' ধর্মীয় জিহাদিদের বংশবৃদ্ধি করবে বলে পরিকল্পনা নিয়েছে। ভোগ্যবস্তু হিসেবে নারীকে দেখা যেত যে আদিম সমাজে, সেই আদিম সমাজের চলে-আসা রীতিনীতিকে এমনিতে আজকের মানুষ মান্য করেন না; কিন্তু যখনই তা ধর্মের বেশ ধরে আসে তখনই অনেকে তার সামনে মাথা নোয়ান, সমালোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করেন। আর রাষ্ট্রও সেখানে 'ধর্মপালনের অধিকার'-এর নামে বর্বরতাকে মেনে নেয়। আর এটা কেবল ইসলামের বা 'ইসলামিক স্টেট'-এর বৈশিষ্ট্য—তা মোটেই নয়।

২০০২ সালে গুজরাটে দাঙ্গার সময়, শ-য়ে শ-য়ে মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। নারীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ না হওয়া শিশুকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করে উল্লাসে মেতেছে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি। সেসবের কোনো শাস্তি হয়নি। আর সেই সময়ের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে এই গেরুয়া ব্রিগেডের বড়ো ভাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ 'লাভ জিহাদ'-এর ধুয়ো তুলে হিন্দু নারীদের রক্ষা করার নামে তাঁদের ওপর বাড়িয়ে তুলেছে নজরদারি ও কড়া নিয়ন্ত্রণ। আর এক সংগঠন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা 'লাভ জিহাদ'-এর পালটা প্রচার করছে 'বহু লাও বেটি বাঁচাও' নামে। হিন্দু ছেলে মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারলে এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। যেন মেয়েরা নিজের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী নন, যেন তাঁরা ভোগ্যবস্তু মাত্র, যা 'ওরা' (মুসলিমরা) 'আমাদের' কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাই আমাদেরও (হিন্দুদের) পালটা ছিনিয়ে নেবার কর্মসূচি নিতে হবে। এর ফলে মেয়েদের চারপাশে লক্ষ্মণরেখা বাড়ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্জনকভাবে আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থা প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হচ্ছে। নারীর শিক্ষা ও নারীর শ্রমের মূল্যকে নাকচ করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা

নিষেধাজ্ঞা। পরিবার, সালিশি সভা, খাপ-পঞ্চায়েতের মতো ব্যবস্থাগুলি বজায় রেখে ঐতিহ্য-সংস্কৃতির নামে, ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে চলছে নারী নির্যাতন।

কোন পথে বাঁচা

ইতিহাস সাক্ষী আছে, যত অত্যাচার ও চোখরাঙানি চলবে তত বেশি বেশি করে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তাই নিষেধাজ্ঞা যেমন বাড়ছে, ব্যারিকেড ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতাও বাড়ছে। ধর্ষণকে আর লজ্জা মনে না করে ধর্ষককে চিনিয়ে দিতে নিজেই এগিয়ে আসছে মেয়েরা। পার্ক স্ট্রিটের সুজেট, হুগলির রমা, ছত্তিশগড়ের সোনি সোরি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন, রুখে দাঁড়াচ্ছেন ধর্ষণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সমকামী, রূপান্তরকামীরা পথে নামছেন তাঁদের অধিকারের দাবিতে। আফস্পার বিরুদ্ধে ইরম শর্মিলা চানুর লড়াই চলছে। কিছুদিন আগে যাদবপুরে একটি ছাত্রীর শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে 'হোক কলরব' আন্দোলন বুঝিয়ে দেয় নতুন প্রজন্ম ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে 'কিস অফ লাভ' বিক্ষোভ, স্যানিটারি ন্যাপকিন আন্দোলনকে লোকে যতই 'এলিট' বলুক না কেন এই সব আন্দোলন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখে এক বড়ো থাপ্পড়। সুতরাং রাষ্ট্র যত আঘাত হানবে যৌনহিংসা বিরোধী আন্দোলন তত শক্তিশালী হয়ে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে রাষ্ট্রের কাঠামোর পরতে পরতে।

পুরুষতন্ত্রের অবসান ঘটবেই। সেদিনই কেবল ধর্ষিতকেই সামাজিক ও আইনি অপরাধীর ভূমিকায় দাঁড়াতে হবে না, আর ধর্ষকের জন্য অপেক্ষা করবে দ্রুত বিচার ও সমাজের ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন।

লেখক তথ্যচিত্র নির্মাতা ও নারী-আন্দোলনের কর্মী

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

স্মরণে

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারকে যেমন দেখেছি

রবীন চক্রবর্তী

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমাদের মণিদা, চলে গেলেন। আচমকাই চলে গেলেন। ওঁকে দেখে মনে হত না যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। সাতাত্তর বছর বয়সে কিছু শারীরিক অসুবিধে তো থাকবেই। সেগুলি যা থাকার ছিল। তবুও অসুস্থতা এবং বয়সের ভারকে উপেক্ষা করেই চলতেন। এ বছর গ্রীষ্মে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় খড়দহে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার বন্ধুদের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন মণিদা। ইদানিংকালে দু-একবার বলেছিলেন বটে যে শরীরটা বিশেষ সুবিধের যাচ্ছে না। অথচ কত কাজ করার রয়েছে। তখন জরুরি কাজ বলতে ছিল ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত ওঁর আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড দূষণ নিয়ে বাংলা-বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করা। মাস তিনেকের মধ্যে ওটা করে ফেলবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শরীর ভালো নেই শুনে বলেছিলাম যে, 'অল্প কিছুদিন একটু বিশ্রাম নিন না।' উত্তরে বলেছিলেন—'তা কী করে হয়? কাজগুলো তো করতে হবে।' এই ছিলেন মণিদা। কোনো কাজ করবেন বলে ঠিক করলে তা শেষ না করা অবধি স্থির থাকতে পারতেন না। সেই হিসেবে একটু জেদি প্রকৃতির মানুষই ছিলেন। এটা প্রশংসার কথা নয় ঠিকই। কিন্তু এটাও ঠিক যে এ যাবৎ মানুষের কল্যাণে যা কিছু হয়েছে তা এমন একগুঁয়ে জেদি মানুষদের কাজের ফলেই হয়েছে। মণিদা সেই গোত্রেরই একজন ছিলেন।

এই রাজ্যে পরিবেশ সমস্যার বিষয়ে প্রথম সোচ্চার হতে দেখা গেছে যে দু-চারজনকে তাদের অন্যতম একজন হলেন মণিদা। গত শতকের সাতের দশকে এই সমস্যা নিয়ে সভা-সমিতিতে বলতেন। পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত বইপত্রের হদিশ দিয়ে পড়তে বলতেন আমাদের। আমার এখনও মনে আছে, সেই সময় একদিন উনি আমাকে ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে ব্যারি কমানরের *দি ক্লোজিং সার্কল* বইটি হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর এমন কত যুগান্তকারী বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মণিদা। যেমন র‍্যাচেল কার্সনের *সায়লেন্ট স্প্রিং*, সুসান জর্জের *হাউ দ্য আদার হাফ ডাইজ*, সুমাকারের *স্মল ইজ বিউটিফুল*, ইত্যাদি বই। এই বিষয়ে উনিই আমার শিক্ষক। সেই সময় মণিদার সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা জানেন যে মাঝে মধ্যে মণিদা ব্যারি কমনারের *দি ক্লোজিং সার্কল* থেকে নানান উদ্ধৃতি দিতেন। 'কমনার্স ল' বলে চারটে সূত্র ওই বইতে রয়েছে। সেগুলি মাঝেমধ্যেই শোনাতেন আমাদের। যেমন, 'দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ ফ্রি লাঞ্চ'। যেটা আসলে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র-র সারবস্তু। অর্থাৎ, প্রকৃতিতে বিনি পয়সার ভোজ বলে কিছু হয় না। এই যে আমাদের চারদিকে জল, বাতাস ও নানা প্রাকৃতিক সম্পদ বিনামূল্যে পাওয়া মনে করে যথেচ্ছ অপব্যবহার করছি, সেটা প্রকৃত বিচারে বিনামূল্যে মিলছে এমন ভাবার কারণ নেই। এর মূল্য কোনো-না-কোনোভাবে একদিন চুকিয়ে দিতে হবে আমাদের। আর একটা উদ্ধৃতি উনি দিতেন।—'এভরিথিং মাস্ট গো সাম হোয়্যার'। মানে অঢেল উৎপাদনের নেশায় যত আবর্জনা আমরা সৃষ্টি করে চলেছি, সেগুলি যাবে কোথায়? এই জঞ্জাল-সমস্যা বিরাট আকার নিয়ে আমাদেরই ঘাড়ে চাপবে একদিন। যদ্দুর মনে পড়ে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সাল নাগাদ। এতদিন আগে করা সেই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সত্য আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

কোনো ভালো বই পাঠ করলে বা নতুন কোনো ভাবনা মাথায় এলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করা ওঁর স্বভাব ছিল। অনেক সময়ই ভালো কোনো বই পড়ার পর পাঁচ-ছ-টা জেরক্সকপি করে ফেলতেন। তারপর সেই বই কল্যাণী থেকে বয়ে এনে কলকাতায় আমাদের হাতে তুলে দিতেন। বন্ধুদের পড়ানোর জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার আর কাউকে করতে দেখিনি। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র পুস্তক পাঠ করে তৃপ্ত হবার মানুষ ছিলেন না মণিদা। দূষণ আক্রান্ত মানুষের দুরবস্থা নিজের চোখে না দেখা অবধি স্বস্তি পেতেন না। এজন্য কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতেন তা বলে বোঝানো যাবে না। গত বছর পনেরো ধরে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড দূষণে আক্রান্ত মানুষজনদের ব্যাধির ধরন নিজের চোখে দেখা এবং সেইসব পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার জন্য কোথায় কোথায় না ঘুরেছেন? পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু কিছু বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। শারীরিক নানান অসুবিধেকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে ঋদ্ধ হয়ে তবেই লিখেছেন আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড দূষণ সম্পর্কিত খান কয়েক বই। এই বইয়ের শেষে রেফারেন্স লিস্ট দেখলেই বোঝা যাবে কী পরিমাণ লিটারেচার ঘেঁটেছেন এই বই লিখতে গিয়ে। দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কত অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কথা বলেছেন।

গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে ওঁকে দেখেছি বালি-খাদান, ইটভাটা, ইত্যাদি এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে খবর সংগ্রহ করতে। ইটভাটার কারণে জমির টপ-সয়েল নষ্ট হওয়ার বিষয়টির গুরুত্ব আমি মণিদার কাছ থেকেই প্রথম জানতে বুঝতে পারি। মণিদা আক্ষেপ করে বলতেন, 'কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সামান্য কয়েক ফুট গভীর মাটির স্তর তৈরি হয়েছে। তাতে জন্ম হয়েছে অজস্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু। আর এদের সহায়তাতেই তো উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি। সেই অমূল্য সম্পদ কী অবলীলায় নষ্ট করছি আমরা!' বলতেন, 'মাটি একবার পোড়ালে সেই জীনাণু-সম্পদ ধ্বংস করা হয়। নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে মাটি। সে মাটিতে আর কখনো প্রাণের সঞ্চার হতে পারে না।' মাটির ভাঁড়ে চা খাওয়াও অপছন্দ ছিল সেই জন্যই।

ব্যান্ডেল-চুঁচুড়া ধরে গঙ্গার ধারে ধারে অবস্থিত পাওয়ার-প্ল্যান্ট ও কেমিক্যাল কারখানাগুলি কীভাবে সেই অঞ্চলের জল, জমি ও মানুষের জীবন বিপন্ন করছে সেটা আমাদের অনেককে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন। সেসব জায়গায় গঙ্গার ধারের জেলে পাড়ার লোকজনের কাছ থেকে শুনেছেন গঙ্গা-দূষণের কারণে তাদের মাছ ধরার জীবিকা কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই সমস্ত বিবরণ লেখা রয়েছে কল্যাণী থেকে প্রকাশিত *প্রগতিবার্তা* পত্রিকার পাতায় পাতায়। মণিদার উদ্যোগেই শুরু হয় *প্রগতিবার্তা*। সহযোগী হিসেবে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অমূল্য মণ্ডল। যাঁর উদ্যোগে আজও টিকে আছে এই পত্রিকা।

প্রগতিবার্তা-র রিপোর্ট ছড়িয়ে রয়েছে ইটভাটার শ্রমিকদের ওপর শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি। এই রিপোর্ট পড়ে মহাশ্বেতা দেবী ছুটে গিয়েছিলেন কল্যাণীতে মণিদার বাড়িতে। মণিদাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখেছেন ইটভাটার শ্রমিকদের অবস্থা। মণিদার পরিবেশ সমস্যা নিয়ে ভাবনা বিশুদ্ধ পরিবেশ প্রেমের কারণে ছিল না। ছিল মানুষের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সহানুভূতি ও সমবেদনার কারণে। সেজন্য শুধু পরিবেশের ব্যাপারে নয়, যখনই মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হতে দেখেছেন তিনি প্রতিবাদ করেছেন, আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের ঘটনার পরে বার বার ছুটে গেছেন সেখানে। আবার পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অর্চনা গুহ মামলায় যথাসাধ্য সৌমেন গুহ-র পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদ বাংলায় অনুবাদ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে প্রচার করেছেন।

মণিদার পড়াশোনা ও গবেষণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনার কাজ করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে। খুবই যত্ন নিয়ে পড়ানোর কাজ করতেন। কেমিস্ট্রি পড়াশোনার মান উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর। যাকে বলে 'সবুজ রসায়ন' তা শুধু সেমিনার-এর বিষয়ে আবদ্ধ না থেকে যাতে রোজকার ল্যাবরেটরির কার্যকরী নিয়ম হয়ে ওঠে তা নিয়ে বিশেষভাবে নানা ভাবনা ছিল। শিক্ষা-সংক্রান্ত নানারকম প্ল্যান-প্রোগ্রাম কার্যকর করার চেষ্টায় দিল্লি-কলকাতার বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-অধ্যাপকদের দোরে দোরে ঘুরেছেন। কোনোখান থেকে সাড়া পাননি। বুঝেছিলেন সত্যিকারের শিক্ষা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই ওপরওলাদের। অবশেষে ঠিক করেন যে নিজেই একটি ল্যাবরেটরি গড়ে তুলে কেমিস্ট্রি শিক্ষা নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন। তাই ২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে নিজের বাড়িতেই একটি ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন।

এই লেখার শুরুতে মণিদার একগুঁয়ে জেদি প্রকৃতির কথা বলেছিলাম। সেই স্বভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কর্মকাণ্ড। এ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা শুধু তাঁর পরিবারের লোকেরাই নন, আমরা বন্ধুরাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে বোঝাতে যে এই বয়সে এমন উদ্যোগ শুরু করে সফল হওয়া শক্ত। কিন্তু তাঁর একগুঁয়েমির কাছে হার মেনেছি আমরা সবাই। আসলে উনি ভরসা করেছিলেন যে একবার শুরু করে দিতে পারলে অনেকে এসে হাত লাগাবে এই কাজে। বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। এজন্য মনোবেদনার শেষ ছিল না মণিদার।

মণিদা বলতেন যে একটি ল্যাবরেটরিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। আর সেটা সম্ভব। সেটাই করে দেখাতে চেয়েছিলেন। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করে বাজার-আছে এমন কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করা যায়। বলতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিগুলি খুব সহজেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। তিনি ঠিক করেছিলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে সিলভার নাইট্রেট তৈরি করবেন। বাজারে এই কেমিক্যালের খুবই চাহিদা। সমস্ত কলেজ ল্যাবরেটরিতে এটি দরকার হয় প্রচুর দাম দিয়ে এটি কেনেন তারা। কোনো কোনো কাজের জন্য খুব বেশি শুদ্ধতার প্রয়োজন হয় না। সেরকম কাজের জন্য তাঁর ল্যাবরেটরিতে তৈরি সিলভার নাইট্রেট খুবই উপযোগী হতে পারত। এজন্য তিনি কেমিক্যালস সরবরাহকারী দু-একটি সংস্থার লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন এবং তাঁরাও কথা দিয়েছিলেন যে এই কেমিক্যাল ওঁর ল্যাবরেটরি থেকে কিনে নিতে কোনোই অসুবিধে নেই তাঁদের। কিন্তু দু-একজন সহযোগী উদ্যোগী মানুষের অভাবে সফল হল না মণিদার এই স্বপ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু দরিদ্র পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে মণিদার সাহায্যে। অনেকে তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত জীবনে। এই দলে শুধুমাত্র তাঁর নিজের বিভাগের নয়, অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত ছিল বহু সংস্থার দিকেও। সাম্প্রতিকতম উদাহরণ বাঁকুড়ায় ডা. পীযূষ সরকার প্রতিষ্ঠিত গরিব মানুষের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র 'আমাদের হাসপাতাল'। সেখানে নিয়মিত গিয়েছেন, আর্থিক সাহায্য করেছেন, আবার সাহায্য করতে পারে এমন মানুষদের জুটিয়ে এনেছেন। এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ওই হাসপাতালের কার্যকরী সমিতির সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়েছিল তাঁকে।

সরাসরি রাজনৈতিক কাজকর্মে কখনোই যুক্ত হননি মণিদা। তবে ষাট-সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছেলেমেয়েদের অনেকেই বিপদে-আপদে তাঁর সাহায্য পেয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সমালোচনা করেছেন। এই নিয়ে লেখালেখি করেছেন।

মণিদার জন্ম অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। মোটামুটি সচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও সেই বালক বয়স থেকেই গ্রামের চাষি জেলে-বাড়ির ছেলেদের সংসর্গই তার ভালো লাগত। তারাই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের খেলার সাথী। তাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন জলে, জঙ্গলে। এই স্বভাব ছাড়তে পারেননি বাকি জীবন। জীবনযাপন নিয়ে যখনই কথা উঠেছে সর্বদা দরিদ্র শ্রেণির মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলতেন—'দেখ কত সরল কত কর্মঠ এই মানুষেরা'। অজস্র গুণ দেখতে পেতেন ওদের মধ্যে, যেটা আমাদের তথাকথিত ভদ্রজনদের মধ্যে দেখতেন না। এই নিয়ে বহু তর্ক করেও ওঁর বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি কখনো।

মণিদার বাড়িতে এক সময় অনেকের মতো আমারও যাতায়াত ছিল। সে বড়ো আনন্দদায়ক ছিল বাড়ির পরিবেশ। এক মেয়ে, দুই ছেলে আর কৃষ্ণাদি—এই নিয়ে সংসার। মণিদার কথা শোনা, ছোটোদের সঙ্গে হই হই, 'আমার ভাইটি'—বলে কৃষ্ণাদির মুখের ডাক ও পরম যত্নে পরিবেশন করে খাওয়ানো, সন্ধ্যে হলে গানের আসর—কৃষ্ণাদির কণ্ঠে গান। সন্ধ্যে পেরিয়ে

যেত। অনেক সময় রাত হয়ে যেত। নির্দেশ হত থেকে যাবার। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে থেকে যেতাম। এ স্মৃতি ভোলার নয়।

একটা মজার ঘটনা বলি। একসময়ে সংসারের কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিকভাবে নেবার প্রথা চালু করেছিলেন মণিদা। ছোটো-বড়ো সবার মতামত নিয়ে কাজ হবে ঠিক হল। একবার এই রকম একটি আলোচনা সভায় রেফারিং করার জন্য আমার ডাক পড়ল। সবার মতামত শোনা হল। হাউস শার্পলি ডিভাইডেড। একদিকে মণিদা, অন্যদিকে আর সকলে। এবার আমার রায় দেবার পালা। আমার উভয়সংকট। একদিকে মণিদার ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে কৃষ্ণাদির আদরযত্ন। আমার রায় মণিদার বিপক্ষে যেতে লাগল। মণিদা এক সময় ঘোষণা করলেন—'রেফারিং বায়াসড'। এরা সব 'অ্যান্টিমণি' মানে মণি মজুমদারের বিরোধী।

শেষ জীবনে মণিদাকে নানাভাবে অর্থ 'অপব্যয়' করতে দেখে বড়োই চিন্তা হত। তাই বিপদকালের জন্য কিছু সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতাম। আমায় থামিয়ে দিয়ে বলতেন—'তার মানে বলতে চাও নার্সিংহোমকে দেবার জন্য টাকা জমাতে?—কক্ষনো না। নার্সিংহোমে আমি যাবই না।' মণিদা জেদ বজায় রেখেছেন। তাঁকে নার্সিং হোমে যেতে হয়নি। বাড়িতে নিজের গড়া ল্যাবরেটরির ঘরে শুয়েই গত ৭ জুন, রবিবার, ২০১৫-তে বিদায় নিয়েছেন মণিদা। □

লেখক রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

টুকরো খবর

একই পরীক্ষায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে চার্জের হেরফের

একই পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে চার্জের এতটা হেরফের কেন?

কলকাতার হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোতে একই পরীক্ষার জন্য চার্জ কখনো কখনো ২০০-৩০০ শতাংশও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কেন এমনটা হয়, উত্তর মেলা ভার!

কলকাতায় এখানে-ওখানে ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন নতুন প্যাথোলজি সেন্টার গজিয়ে উঠছে। যে যার খুশিমতো দর হাঁকছে। কেননা কোন পরীক্ষার ঠিকঠাক কী চার্জ হওয়া উচিত তার উপর নজরদারি মতো কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা তো নেই।

বেসরকারি হাসপাতালগুলোর অজুহাত—সরকারি হাসপাতালে তো ভরতুকি দেওয়া হয়, ওরা পারে, আমরা কী করে পারব?

যেমন ধরুন, বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে সিটি স্ক্যানের (মগজের) দর ৭০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। ওই একই পরীক্ষা বেসরকারি হাসপাতালে করালে, সরকারি হাসপাতালের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি চার্জ পড়ে। অ্যাঞ্জিয়োগ্রামের জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকারি হাসপাতালের তুলনায় কখনো কখনো ১২গুণ চার্জ করে। সরকারি হাসপাতালের তুলনায় এমআরআই-এর চার্জ বেসরকারি হাসপাতালে দ্বিগুণ; তলপেটের আলট্রাসোনোগ্রামের চার্জ কখনো কখনো ৭ গুণ; এমনকী হিমোগ্রাম-এর মতো সাধারণ পরীক্ষার চার্জও ৮ গুণ বেশি।

কিছু বিশেজ্ঞর মতামত সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে এভাবে তুলনা টানা যায় না। বেশ, তবে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর একটার সঙ্গে আর একটার এতটা ফারাক কেন? যেমন মগজের এমআরআই করার জন্য মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চার্জ ৭০০০ টাকা; অ্যাপোলোতে তা ৮,৯০০ টাকা আর এ এম আর আই-এ ৬৫০০ টাকা। যেকোনো সরকারি হাসপাতালে এই একই টেস্ট খুব বেশি হলে ৩০০০ টাকার মধ্যে করিয়ে নেওয়া যায়—তবে সময় অনেক বেশি লাগবে। কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর বক্তব্য এসব প্রযুক্তি এবং প্রণালীর হেরফেরের জন্যই ঘটে। অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হাসপাতাল তো অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে একাসনে বসতেই নারাজ। তাদের কথা, তারা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাসপাতাল; সুতরাং কেবলমাত্র কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হাসপাতালের সঙ্গেই তাদের তুলনা চলতে পারে।

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার অরিন্দম ব্যানার্জী বলেন, 'দরের ফারাক হয় কারণ এটা নির্ভর করে মেশিনের গুণমান, ডাক্তারের ও টেকনিশিয়ানের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার উপর যাঁরা প্রায়শই চড়া দর হাঁকেন।'

মেডিকার কুণাল সরকার বলেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলো প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যাতে রোগীরা অপারেশনটা করাতে পারে—যাতে খরচ উঠে আসে, এবং পরিষেবার গুণমানের দিকে কড়া নজর থাকে। এগুলোই মূল বিবেচ্য। আর হাসপাতাল ভেদে চার্জের হেরফের একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে থাকাই শ্রেয়, খুব বেশি হলে ১০ শতাংশ। তার থেকে বেশি হওয়া কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু বাস্তবে সেটাই হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য পি কে নেমানি মনে করেন, যত বেশি ডায়গনস্টিক সেন্টার খুলবে তত ভালো—এতে প্রতিযোগিতা বাড়বে ও চার্জের হারে একটা সমতা আসবে এখন যে চার্জগুলো একেবারেই অযৌক্তিক।

অঙ্কোলজিস্ট সুবীর গাঙ্গুলীর কথায়—রেডিয়োথেরাপির একটা প্যাকেজ আর জি কর হাসপাতালে যেখানে ৫০০ টাকা (বিপিএল হলে বিনামূল্যে) সেই একই প্যাকেজ যেকোনো কর্পোরেট হাসপাতালে ৭০,০০০থেকে ১,৫০,০০০ টাকা। ওঁরা বলতে পারেন, ওঁদের মেশিনপত্র অনেক উচ্চমানের, অনেক দামি; কিন্তু সেক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যার মেশিন সবার সেরা তারা কী করে মাত্র ২০,০০০ টাকা চার্জ করে!

সূত্র: *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ৮ জুন, ২০১৫।

শরীর নিয়ে ‘মিথ’ বা ‘লোককথা’

প্রাচীন পর্যবেক্ষণনির্ভর শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে অনেক ‘মিথ’ই সমাজে চালু—মানুষের মনে শেকড় গেড়ে বসা। এলাকাভেদে সেসব মিথের নানা রকমফেরও আছে। সেগুলোর কোনো-কোনোটা হয়তো স্বাস্থ্যরক্ষায় বা রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাজে লেগে যায়—অসাধারণ পর্যবেক্ষণের কারণে। কিন্তু বেশির ভাগই ‘মিথ’ই আজগুবি, যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক। এই ‘মিথ’গুলো শরীরের যত্ন নিতে বা রোগ-নিরাময়ে কোনো কাজে তো লাগেই না বরং ক্ষতি করে বিস্তর। এসব নিয়েই বিশদে আলোচনা করছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

‘‘লোকে কি না বলে’’, ‘‘লোকের কথায় কিছু যায় আসে না’’—এসব বলে যতই তুড়ি বাজাই— লোককথা সর্বত্র মানুষের মনের অনেক গভীরে শেকড় চারিয়ে থেকে যায় যুগ যুগ ধরে—বিস্তৃত হয় সমাজের এ কোণ থেকে ও কোণে। কোনো একটা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়তো বদলে যায় কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ‘মিথ’ তৈরি হয় তা উপড়ানো কঠিন। আর যে দেশে ‘‘গণেশমূর্তি শুঁড় দিয়ে চোঁ চোঁ করে দুধ খাচ্ছে’’ এই মিথ দাবানলের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সে দেশের কথা আরও একটু আলাদা। নিজের ‘শরীর’ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় আর বেশিরভাগ মানুষই ভালোবাসে একটা শক্তপোক্ত ‘বিশ্বাস’-এর দণ্ড ধরে জীবন কাটাতে। তাই শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে নানারকম ঠিক-ভুলের অলিগলি পেরিয়ে তৈরি হয়েছে অজস্র মিথ বা লোককথা—গ্রহণের সময় খেতে মানা, অমুকবারে নখ কাটা মানা, তমুক তিথিতে বেগুন খাওয়া মানা—এরকম কত না নিষেধ! আবার জন্ডিস হলে মন্ত্রপূত মালা পরা, কুকুরে কামড়ালে মন্ত্রপূত কলা খাও, আকাশে তারা খসলে সাত বামুনের নাম করো—এরকম কত না বিধি!

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না সে বিশ্লেষণ না করেই সব ‘মিথ’-কে নঞর্থক ভাবে ছুড়ে ফেললে লোকসংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করা হয়। দু-একটি ‘মিথ’ বিশেষ করে চর্মরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। গত তিরিশ বছর ধরে সরকারি হাসপাতালে প্রধানত ‘‘নিম্ন আয়’’ শ্রেণির মানুষজন, প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজনকে দেখতে গিয়ে যেগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তা নিয়ে একটু চর্চা বা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া যাক। আর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক মিথগুলো ঐতিহাসিক নথি হয়েই থাক, পালনীয় তালিকাভুক্ত নয়।

জলবসন্ত নিয়ে মিথ

বসন্ত মা শীতলার দয়া—এসময়ে বাড়িতে আমিষ খাবার ঢুকলে দেবী রুষ্ট হবেন। ওষুধ খেয়ে গুটি বেরোনো বন্ধ করলে শরীরের ক্ষতি হয় বরং মেথি ভেজানো জল খেয়ে যত বেশি গুটি বেরিয়ে যায় ততই মঙ্গল। রোগশয্যায় বা রোগীর ঘরে নিমপাতার গোছা ঝুলিয়ে রাখতে হয়। নিমডাল দিয়ে গা চুলকানো যায়। রোগ শেষে নিমপাতা সেদ্ধ করা জলে চান করা অবশ্যকর্তব্য।

এরকম বসন্ত রোগ নিয়ে সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক মিথ-এর সংখ্যা অঢেল, বা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই। একসময়ে গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কারের আগের যুগে, গুটিবসন্তে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার যুগে মানুষের মনের আতঙ্ক আর অসহায়তার দুর্বল জায়গাটা দিয়েই শীতলা দেবীর প্রবেশ। আজ গুটিবসন্ত পৃথিবী থেকে নির্মূল, জলবসন্তের কারণ varicella zoster নামক ভাইরাস সেটা জানা হয়ে গেছে, Acyclovir জাতীয় কার্যকরী অ্যান্টিভাইরাল ওষুধও হাতের মুঠোয় মজুত। তবু ওই যে বলেছি—বিজ্ঞান বদলায়, ‘লোককথা’ এগোও না, পেছোয়ও না, স্থায়ী বটগাছের মতো একজায়গায় শেকড় গেড়ে থাকে। এখনও বহু শিক্ষিত রোগীকেও দেখেছি জলবসন্তের ওষুধ খেতে নির্দেশ দেবার পরও সাতদিন বাদে রোগের মারাত্মক হাল করে এসে বলেন—‘‘আসলে মায়ের দয়া তো, কী থেকে কী হয়—বাড়ির বয়স্করা বারণ করলেন, ওষুধটা খাইনি। আর যদিও সবকিছু খেতে বলেছিলেন, আমরা কিন্তু এ রোগে নিরামিষই খাই।’’ জলবসন্ত অল্প বয়সিদের ক্ষেত্রে মোটেই গুরুতর কিছু রোগ নয়, নিজের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকলে এমনিতেই নির্দিষ্ট সময়ে সেরে যায় এটা ঠিক। কিন্তু তাড়াতাড়ি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ খেলে ভোগান্তি কম হয়। রোগজনিত জটিলতাগুলোও এড়ানো যায়। আর একটু বেশি বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ঠিক সময়ে ঠিক ডোজে না খেলে সামান্য জলবসন্ত রোগও মারাত্মক হতে পারে। ডায়াবিটিস বা অন্য কোনো কারণে যদি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে—একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়েও সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় না। সুতরাং গায়ে জলবসন্তের ফোসকা দেখলেই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খাওয়া অবশ্যকর্তব্য। গায়ে যত বেশি ফোসকা বেরিয়ে যাবে তত ভালো এই ধারণাটিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মেথি মশলাটি ভালো—তরকারির ফোড়নে মন্দ লাগে না—কিন্তু জলবসন্তে মেথির ভূমিকা নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাতায় কিছু লেখা নেই। বইয়ের পাতার থেকে লোকের মনের পাতায় ‘নিমপাতা’ নিয়ে যে একটা ‘‘সর্বরোগ হরণকারী’’ মিথ তৈরি আছে তাতে সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ! নিমপাতা একটি অনেকগুলো (এখন পর্যন্ত ২৫টিরও বেশি) কার্যকরী গুণ সম্পন্ন মৌল ও যৌগসমৃদ্ধ ভেষজ। শুধু প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র নয়—নিমপাতার কার্যকরী উপাদান (active ingradient) রসায়নবিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত। এবার এতগুলো উপাদান, বিশেষ করে Azadirachtin একটি অতি শক্তিশালী যৌগ যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অনেকগুলো উপকারী কাজ করে। কিন্তু কোনো যৌগেরই পুরোটাই উপকারী প্রভাব হয় না, আর কোনো ওষুধেই সমস্ত ব্যাধি সারে না। তাই নিমপাতার ‘সর্বচর্মরোগ নিবারণ

ক্ষমতা' মিথটা নিয়ে ভেবে দেখার আছে। আর জলবসন্তে ঘরে নিমপাতা রাখার ব্যাপারটা গোপাল ভাঁড়ের সেই তালগাছের উপর হাঁড়ি রেখে নীচে আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধার মতোই হাস্যরস ছাড়া আর কিছু নয়। নিমপাতার কার্যকরী উপাদানগুলো কাজ করে মুখে খেলে—গায়ে বুলোলে নয়। বরং অপরিষ্কার ধুলোবালি জীবাণুযুক্ত নিমপাতা গায়ে বুলোলে বা বেটে লাগালে জলবসন্তের ফোসকা জীবাণু সংক্রমণে দূষিত হতে পারে। নিমপাতায় কারও কারও অ্যালার্জিও হয়।

জলবসন্তের পথ্য সম্পর্কে আগে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকাতেই লেখা হয়েছে। রোগীকে আমিষ খাবার দিতে কোনো নিষেধ নেই, বরং আমিষ খাবারের প্রোটিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, উপযুক্ত পুষ্টি জুগিয়ে দ্রুত রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। যারা নিরামিষাশী তারা দুধ, ছানা জাতীয় প্রাণিজ প্রোটিন খাবেন। তবে সব খাবারই হালকা তেলমশলা দিয়ে এমনভাবে রান্না করতে হবে যাতে সহজপাচ্য হয়। বাড়ির লোক, পাড়া প্রতিবেশীও আমিষ খাবার খাবে না? আবার সেই গোপালভাঁড়ের শরণাপন্ন হতে হবে!

''বসন্তরোগে শুকিয়ে খোসা ওঠার সময় খোসা থেকেই রোগ বেশি ছড়ায়''—এটাও জলবসন্তের ক্ষেত্রে একেবারে ভুল কথন! এই কথাটি গুটিবসন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল কিন্তু জলবসন্তে ঠিক উলটো। গায়ে ফোসকা বেরোনোর ৫-৭ দিনের মধ্যেই রোগীর আর রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা থাকে না, রোগ যেটুকু ছড়ায় সেটা রোগের প্রথমদিকে, বিশেষ করে গায়ে ফোসকা বেরোনোর আগে। শুকনো খোসাতে একেবারেই জীবাণু থাকে না।

মা শীতলা তো তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন অথবা অন্য কারও উপর দয়াবর্ষণ করতে গেলেন—অর্থাৎ রোগী সুস্থ হয়ে উঠল—কিন্তু শরীরে বিশেষ করে মুখে যে দাগগুলো থেকে গেল তা নিয়ে মনোবেদনা যে রোগের চেয়েও বেশি। কী করা যায়? কেন—''ডাবের জল লাগাও''—ডাবের জল বেশি মাত্রায় পটাশিয়ামযুক্ত সুস্বাদু ও উপকারী পানীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বসন্তের দাগ মুছে ফেলতে এর ভূমিকা জানা নেই কিছু। এ প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবাদপ্রতিম ত্বক বিশেষজ্ঞ মাস্টারমশাই-এর কথা মনে পড়ছে—''খাবার জিনিস খাবেন, মুখে লাগিয়ে নষ্ট করবেন না''। আসলে অতিরিক্ত জীবাণু সংক্রমণ কিছু না হলে জলবসন্তের দাগ ৬ মাসের মধ্যে এমনিতেই চলে যায়।

চুল নিয়ে নানা ভুল

''কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল'' এই রূপকথার মিথ আজও আমাদের পিছু ছাড়েনি। অনেক বছর ধরে অনেক শিক্ষা সংস্কৃতি অনেক আলো আঁধার পথে যাতায়াতের পরেও সব মেয়েই আজও চায় ঘন চুল। সবচেয়ে 'প্রিয়' আর সবচেয়ে 'ভয়' থেকেই মিথ তৈরি হয় একথা আগেই বলেছি। 'চুল' নিয়েও তাই কত না মিথ।

১. সবচেয়ে বেশি চালু 'চুল-মিথ' হল চুলের গোড়ায় ভালো করে তেল মালিশ করলে চুল ভালো হয়। নানা তেলের কোম্পানির বিজ্ঞাপন এই মিথকে বেশ ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে—তাদের ব্যাবসাও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসলে চুলে তেলের কাজ শুধু চুলের অবিন্যস্ত ভাবটা কমানো, যাতে রুখুসুখু না দেখায়, ঠিকমতো বাগ মানিয়ে চুল আঁচড়ানো যায়। চুলের দৈর্ঘ্য বা ঘনত্ববৃদ্ধিতে তেলের সত্যিই কোনো ভূমিকা নেই।

২. রথের দিন চুল কাটলে চুল ভালো হয়—আবারও সেই একটা কথা, চুল কাটার সঙ্গে চুল ভালো হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। শিশু বয়সে অনেককে বারবার নেড়া করা হয় ভালো চুল হওয়ার আশায়—বৃথা চেষ্টা। একজন মানুষের চুলের ঘনত্ব কেমন হবে তা জন্ম থেকেই মোটামুটি সুনির্দিষ্ট—কোনো চুলের অসুখ বা পুষ্টির ঘাটতি, শরীরের কোনো গুরুতর অসুখ, কিছু ওষুধের প্রভাব, গর্ভধারণ ও স্তন্যপান করানো ইত্যাদি নানা কারণে যখন চুলের ঘনত্ব কমে—সেটাই শুধু চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হয় ও চুল আবার পূর্বাবস্থার দিকে যায়। কোনো কারণ ছাড়া একজনের চুলের ঘনত্ব কোনোভাবেই বাড়ানো যায় না—একথা অপ্রয়োজনীয় টানা ভিটামিন, চুলের তেল, চুলবর্ধক নানা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রথযাত্রা তো আষাঢ় মাসে—তখন প্যাচপেচে গরম—সেই সময় বড়ো চুল ঠিকমতো শুকোয় না, দুর্গন্ধ হয়—যত্ন নেওয়ার হাজারো ঝক্কি—একটু ছেঁটে দিলে আরাম পাওয়া যায় তো বটেই এতে কোনো দোষ নেই, শুধু চুল ভালো হবে না ভাবাই ঠিক!

৩. চুলের জটা—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দান। যার মাথায় জন্মের সময়ে জটা থাকে—জীবনে কখনো তা কাটতে নেই। জটাতে শিবঠাকুরের প্রকাশ! 'চুলে জটা' ব্যাপারটা কী? অবিন্যস্ত চুলে কখনোসখনো জট সবারই হয়, কিন্তু গোছা গোছা চুল একসঙ্গে লেগে জড়িয়ে যখন মোটা দড়ির মতো আকার নেয় আর কোনো প্রকারেই এক-একটা চুলকে আর আলাদা করা যায় না তাই হল 'জটা'। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের 'জটা' সৃষ্টির উপায় কৃত্রিমভাবে ছাইভস্ম মেখে দীর্ঘদিন না আঁচড়ে। কিন্তু কারও কারও জন্মগত চুলের গঠনের ত্রুটির জন্য 'জটা' দেখা যায়। অনেক সময় জন্মের সময় এক-দু-গাছা জটা থাকে—কেটে ফেললে ধীরে ঠিক হয়ে যায় আবার কিছু বিরল ক্ষেত্রে জন্মগত ত্রুটিতে যতই কাটা হোক আবার জটার মতো হয়েই চুল গজায়। ডাক্তারি পরিভাষায় এই 'জটা'-র নাম Plica Polomica or Plica Neuropathica। অনেক শিশুর দেখা যায় মাথার 'জটা' সযত্নে রেখে দেওয়া হয়—এই 'ঈশ্বরত্ব'-এর বোঝা বহন করা কিন্তু শিশুটির পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে।

৪. সাঁঝের বেলা এলোচুলে বেরোলে ভূতে ধরে, দিনের বেলা এলোচুলে থাকলে ভ্রাতার অমঙ্গল হয়—অর্থাৎ এলোচুল কখনোই কাম্য নয়। লম্বাচুল খোলা অবস্থায় রাখলে বেশি অবিন্যস্ত হয়, জট পড়ে—ফলে চুল আঁচড়ানোর সময় বেশি চুল ওঠার সম্ভাবনা থাকে, এজন্য হয়তো এইসব প্রবাদ চালু হয়েছিল। তা বলে ভূতে ধরা বা ভাইয়ের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

এ ছাড়া চুলে কেশুতপাতা, জবাফুল থেঁতো করে, আরও কত না গাছগাছালি লাগানোর প্রচলন আছে চুল ঘন হবার জন্য—এইসব ভেষজের মধ্যে কার্যকরী উপাদান কী আছে, তার গুণাগুণ কী সে সম্পর্কে সঠিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ কমই হয়েছে, কাজেই মন্তব্য মুলতুবি থাক।

আধুনিক 'কর্পোরেট' মিথ!

মিথ কি শুধু প্রাচীনকালেরই? আমরা সবাই হয়তো বুঝতে পারছি না—অত্যন্ত ধীর গতিতে চলা অভিযোজনের মতো এখনও নিত্য নতুন 'আধুনিক মিথ' তৈরি হয়েই চলেছে—যেমন, সুন্দর হতে গেলে ফর্সা হতেই হবে আর ফর্সা হওয়ার জন্য অমুক ব্র্যান্ডের প্রসাধনী মাখতেই হবে,

তমুক দামি পার্লারে চুল কাটতেই হবে, হাতে বড়ো নখ রেখে 'নখ সৌন্দর্য চর্চা" করতে হবে, সময়, অনুষ্ঠান অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে হবে—তা ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন কর্পোরেট-বাণিজ্যমুখী সমাজের নিয়মে বেঁধে দেওয়া সাজপোশাক। শিশুকেও 'ডায়াপার' পরাতেই হবে। আরও কত, খুঁজলেই পাবেন। প্রাচীন মিথের সঙ্গে আধুনিক মিথের পার্থক্য হল— প্রাচীনকালে মিথের জন্ম ছিল পর্যবেক্ষণ-নির্ভর (পর্যবেক্ষণ সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হত না) আর আধুনিক মিথ পুরোটাই বাণিজ্য-নির্ভর। এর মধ্যে ত্বকের সঙ্গে সরাসরি দু-টো অতি চালু আচরণ নিয়ে আলোচনা করি, কারণ তা মোটেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। প্রথমত শিশুকে 'ডায়াপার' পরানো। আজকাল সব মায়েদেরই দেখি পাছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই সারা রাত নবজাত শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে রাখেন। এর ফলে ডায়াপারের সঙ্গে শিশুর নরম স্পর্শকাতর ত্বক লেপটে লেগে থাকে, কিছুটা ভিজেও থাকে ঘামে, শিশুর হিসিতে—ফলে স্পর্শজনিত একজিমা ও ছত্রাক সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী! প্রায়ই দেখি আর শিশুটির জন্য কষ্ট পাই। মা-বাবাকে ভেবে দেখতে হবে আবার নরম পুরোনো সুতির কাপড়ের কাঁথা, ল্যাঙটে ফিরে যেতে পারবেন কি না। নরম পুরোনো সুতির কাপড় অনেক ভালো জল শোষণকারী আর নিখরচায় পাওয়া যায় এখনও—একটু খেয়াল রেখে বদলে দিলেই হল। শুধু এই বদলে তাদের অহমিকার বেলুনে একটু ফুটো হবে। গ্রাম্য ঘুনসি আর আধুনিক 'হাগিস্' কিন্তু একই গোত্রীয়—বরং ক্ষতির দিক থেকে আধুনিক বস্তুটি বেশি বই কম নয়।

দ্বিতীয়ত, পুরোনো দিনের অনেক মহিলা এখনও পালন করেন—সন্তানের জন্মবারে নখ কাটা মানা। আর আধুনিক মহিলারা পালন করেন—সর্বদাই নখ কাটা মানা—দীর্ঘ নখ দু-হাতেই, তাতে শুধু নেলপালিশ নয়—আরও বিচিত্র কারুকার্যের মাত্রা যোগ হয়ে চলেছে দিনদিন—শিল্পীর নান্দনিক বোধের পরিচয় ক্যানভাস বড়ো নখ ছাড়াও পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে সে এক অন্য বিতর্ক। বড়ো নখে ক্ষতি যা যা হয় তা হল—পরিষ্কার রাখার যত চেষ্টাই করা হোক আঙুলের চামড়া ও নখের খাঁজে কিছু জীবাণু থাকবেই যা থেকে পেটখারাপ হয়—আগে ছোটোবেলার সব স্বাস্থ্য বইতে এটা লেখা থাকত ও মানুষ মেনে চলত। শরীরের বিভিন্ন অংশে নখের ডগার ছোঁয়াতে ত্বকের উপরিভাগ ঘষে উঠে যায় যা সবসময় খালি চোখে দেখাও যায় না আরও এই 'ঘষে যাওয়া' জায়গাটা থেকেই ত্বকের উপরিভাগের জীবাণু ভিতরে ঢুকে ফোঁড়া ইত্যাদির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যারা বড়ো নখ রাখেন অনেক সময়ই তারা ত্বকের সংক্রমণে বেশি ভোগেন।

সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবথেকে বেশি মারাত্মক আধুনিক মিথ—''ফর্সা না হলে জনম বৃথা''— এটার উল্লেখ করলাম শুধু, বিশদে অন্য বন্ধুর লেখায় পড়বেন। ত্বক এবং চুল নিয়ে অজস্র মিথ ও ভুল ধারণা আছে এগুলো আমরা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পরবর্তী সংখ্যায় এক এক করে বলব।

ডা. শর্মিষ্ঠা দাশ, এমবিবিএস, ডিভিডি। একটি সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

ভ্রম সংশোধন

মারে ডাক্তার রাখে কে? বদল আনার বই, পুস্তক সমালোচনাটিতে ভাইরাল জ্বরে প্লেটলেট কাউন্ট বাড়ার কথা বলা হয়েছে। আসলে কোনো কোনো ভাইরাল জ্বরে প্লেটলেট কাউন্ট কমে।

অনিবার্য কারণবশত মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার-র কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন ২০০২-এর দ্বিতীয় অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

চিকিৎসক

স্বপ্নদোষ

ভালো কথা হচ্ছে সুপ্তিস্খলন বা Nocturnal Emission। কিন্তু ছোটো হ্যান্ডবিল, ল্যাম্পপোস্টে এবং পাবলিক ইউরিনালে লাগানো পোস্টার থেকে 'স্বপ্নদোষ' কথাটা পুরুষ মানুষদের বেশি পরিচিত। আর আছে কৈশোর যৌবনের বন্ধুদের সরস আলোচনায় উঠে আসা বিষয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'দোষ' কথাটা। এখন দেখা যাক এটা আদৌ কোনো 'দোষে' দুষ্ট কিনা।

কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনে এই সুপ্তিস্খলন সব থেকে বেশি চলে। তবে জীবনের অন্য সময়ও হতে পারে। দেখা গেছে ৮৩ শতাংশ পুরুষ মানুষের জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে এটা হয়। সাধারণত একটি যৌনতামূলক স্বপ্ন দেখে তারপর ঘুমের মধ্যেই তার বীর্যপাত হয়ে যায়। দেখা গেছে নারী পুরুষ উভয়েরই স্বপ্নের ৮ শতাংশ যৌনতামূলক থাকে। যার মধ্যে ৪ শতাংশ থেকে সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ হয়। এটা একটি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু 'বীর্য' বা 'ধাতু'-র মূল্য সম্পর্কে আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশে যে এক ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছে তারই ফলে এটাকে একটা রোগের পর্যায়ে নিয়ে চলে গেছে। যেমন 'হস্তমৈথুন' করে 'বীর্য' নিষ্ক্রমণ সম্পর্কেও এই ধরনের চালু ভুল ধারণা আছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই 'ধাতু' পাতের ব্যাপার নেই। মেয়েদের সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ হয় এটাই অধিকাংশ মানুষের ধারণাতে নেই। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনতামূলক স্বপ্নের সঙ্গে তাদের যোনি সিক্ত হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে চরম যৌন তৃপ্তি বা orgasm হয়ে যায়।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে দেখা গেল সুপ্তিস্খলন স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু অনেকেই অতিরিক্ত উদ্বেগ বা অবসাদে ভোগেন বিষয়টি নিয়ে। কারণও কারও খিদে, ঘুম কমে যায়। সাধারণ সুপ্তিস্খলনের চিকিৎসার দরকার হয় না। কিন্তু মানসিক উদ্বেগ বা অবসাদ এসে গেলে তার চিকিৎসা করা দরকার। তাহলে জানা গেল স্বপ্নের মধ্যে বীর্যপাত সেভাবে কোনো 'দোষের নয়'।

পথ দুর্ঘটনা, হাড় ভাঙা ও প্রবল রক্তক্ষরণ এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা

এই সেদিন, ১৫ মে ২০১৫, অর্চনা কিরিট পান্ডিয়া গোরেগাঁও থেকে ফেরার পথে বানরাই থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে গাড়ি চাপা পড়েন। সন্ধ্যাবেলা, পথে যথেষ্ট লোকজন ছিল। কিন্তু অন্তত মিনিট কুড়ি তাকে কেউ তোলেনি, এমনকী থানায় গিয়ে পুলিশে খবরও দেয়নি। পুলিশ তাকে দেখে ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ডাক্তার দেখেই তাকে 'মৃত' ঘোষণা করেন। চারদিন আগে টিসিএস কোম্পানির কাজে যোগ দিয়েছিল ২২ বছরের অর্চনা। একটা গাড়ির ধাক্কা তার জীবন কেড়ে নিল। সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে সে হয়তো বেঁচে যেত। কেন পথচারীদের কেউই এগিয়ে আসেননি সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আজ এখানে এটুকু অন্তত আমরা জেনে নিতে পারি, কী করে আপনি একজন পথ-দুর্ঘটনায় আহত মানুষকে জীবন দিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনিই পারেন, আর তার জন্য ডাক্তার হবার দরকার নেই, লিখছেন **ডা. অর্ক বৈরাগ্য**।

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার মানুষ ক্যান্সারে মারা যান। কিন্তু এই ভারতেই প্রতি বছর ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার মানুষ পথ দুর্ঘটনার শিকার হন আর মারা যান প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার মানুষ। পৃথিবীর নিরিখে ভারতবর্ষে গাড়ি রয়েছে সারা বিশ্বের ১% আর পথ দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যান সারা বিশ্বের ১০%। বর্তমান বিশ্বে পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু সোয়াইন ফ্লু বা এইচআইভি/এইডস-এর মতোই একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে আর মানুষ মারার ক্ষমতার বিচারে এর স্থান ১১ নম্বরে।

দেখা গেছে পথ দুর্ঘটনায় প্রধানত যারা আক্রান্ত হন তারা হলেন পথচারী, সাইকেল-আরোহী এবং বাসযাত্রী। আর ক্ষতিগ্রস্তের হিসাব সাধারণত দুই স্তরের; প্রাথমিক দুর্ঘটনায় তো কিছু মানুষ মারা গেলেনই, যারা কোনো প্রকারে হাসপাতালে পৌঁছালেন তারা আগামী কয়েক বছরের জন্যে বা কখনো সারা জীবনের জন্যে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এবং পারিবারিক ক্ষতির শিকার হলেন। দুর্ঘটনার পরের প্রথম ঘণ্টাটিকে বলা হয় 'গোল্ডেন আওয়ার', এই সময়ের মধ্যে আহত ব্যক্তি চিকিৎসার সুযোগ পেলে ওই দুই ক্ষতির পরিমাণই অনেকটা কমে যায়।

আপনি কোনো পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হলে যা করণীয়

দুর্ঘটনার পরিমাণ ও ভয়াবহতা অনুমান করার চেষ্টা করুন। আশেপাশের আরও মানুষজনকে ডাকুন ও প্রয়োজনীয় কাজগুলি ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করুন; যেমন অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা, পরিষ্কার কাপড়, শক্ত কাঠ, সাবান জল ইত্যাদি জোগাড় করা, পুলিশ ও আহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা ইত্যাদি। এরপর আহত এক বা একাধিক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করুন। যদি আহত ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দেন ও নিজের নাম ঠিকানা বলতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আহতের শ্বাস-প্রশ্বাস মোটামুটি ঠিক আছে ও মাথার চোট খুব গুরুতর নয়।

ট্রায়েজ

যেকোনো দুর্ঘটনায় যেখানে একাধিক মানুষ আহত সেখানে এই পদ্ধতি খুব প্রয়োজনীয়। সবুজ, হলুদ, লাল ও কালো এই চার রঙের ভিত্তিতে ঠিক করা হয় কোন ব্যক্তিকে এখনই চিকিৎসা দিতে লাগবে (লাল), কার জন্যে হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে (সবুজ ও হলুদ), আর কারও অবস্থা এতটাই খারাপ যে কোনোরকম চিকিৎসার পদক্ষেপই তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না (কালো)। এর ওপরে ভিত্তি করেই কিছু আহতকে সবার আগে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

"এ, বি, সি"

অর্থাৎ নাক, মুখ ও শ্বাসনালী (Airway), শ্বাস প্রক্রিয়া (Breathing), ও রক্ত চলাচল (Circulation) ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। আগেই বলেছি আহত যদি চিৎকার করেন বা নিজের নাম বা অন্য কথা বলতে পারেন তাহলে ধরে নেওয়া যায় তাঁর শ্বাসক্রিয়া মোটামুটি ঠিক আছে। অন্যথায় যদি দেখা যায় রোগী কথা বলতে পারছেন না, মৃতবৎ শুয়ে আছেন, তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে বুকে কান পেতে বা নাকের সামনে আঙুল রেখে দেখতে হবে শ্বাস চলছে কিনা। এরপর রোগীর মাথা একদিকে একটু কাত করে মুখ খুলে দেখতে হবে মুখের মধ্যে কিছু আটকে আছে কিনা; থাকলে তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে সেটাকে বের করতে হবে। কোনো কাপড়, যেমন গামছা বা তোয়ালে, গুটিয়ে রোল বানিয়ে আহতের মাথার নীচে রাখতে হবে—এতে শ্বাসনালি সোজা হয়ে থাকে ও শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। কবজির কাছে ধমনিতে চাপ দিয়ে দেখতে হবে নাড়ির গতি ঠিক আছে কিনা; দুর্বল এবং দ্রুত নাড়ির গতি অভিঘাত বা 'শক' হয়েছে এমন বোঝায়। রোগীর বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের জন্যে এমনটা হতে পারে। এ নিয়েই আমাদের পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা।

দুর্ঘটনাজনিত রক্তপাত

বিভিন্ন পরিমাণে রক্তপাত

আমাদের শরীরে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে। রক্তপাতের পরিমাণের ওপর আহতের রোগলক্ষণ ও তার চিকিৎসা নির্ভর করে।

- ৭৫০ মিলিলিটার অবধি রক্তপাতে বিশেষ কিছু রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমাদের শরীরে থাকা রক্তকোষ ও সঞ্চিত জল এর মোকাবিলা করতে পারে। হাতে-পায়ে ও মুখে আঘাতে মাঝারি রকমের কেটে যাওয়াতে এইরকম রক্তপাত হতে পারে। একে বলব মৃদু রক্তপাত।
- ৭৫০ থেকে ১৫০০ মিলিলিটার রক্তপাতে আহতকে কিছুটা ফ্যাকাশে লাগে, তাঁর জলতেষ্টা পায় ও নাড়ির গতি দ্রুত হয়। এটি হল মাঝারি রক্তপাত।
- ১৫০০ থেকে ২০০০ মিলিলিটার রক্তপাতে আহত ভুল বকতে পারেন, আরও ফ্যাকাশে লাগে, শ্বাসের গতি ও নাড়ির গতি আরও বাড়ে। একে বলব তীব্র রক্তপাত।
- ২০০০ মিলিলিটারের থেকে বেশি হল অতি তীব্র রক্তপাত। এতে নাড়ির গতি বাড়লেও তা দুর্বল হয়ে যায়, আহত জ্ঞান হারান, শরীর খুব ঠান্ডা হয়ে যায় ও মুখচোখ শুকিয়ে যায়। কোনো বড়ো ধমনি কেটে গেলে (গলার বা পায়ের), লিভার, প্লীহা বা অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে, জঙ্ঘার হাড় ভেঙে গেলে এইরকম রক্তপাত হতে পারে।

কোথা থেকে রক্তপাত হচ্ছে? কী করবেন?

শরীরে রক্তপাতের উৎস মূলত দু-টি। শিরা কেটে রক্তপাত হলে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে ও এই রক্ত গাঢ় (কালচে) লাল রঙের হয়। এই রক্তপাত বন্ধ করা তুলনামূলকভাবে সোজা। অন্যদিকে ধমনি কেটে গেলে ফিনকি দিয়ে ও নাড়ির গতির তালেতালে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত বেরোতে থাকে, এই রক্তপাত বন্ধ করা মুশকিল।

নাক দিয়ে রক্তপাত হলে নাকের নরম অংশে ১০ মিনিট চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। রোগীকে একদিকে কাত করে শুইয়ে রাখুন। মুখের ভেতর থেকে রক্তপাত হলে রক্তপাতের দিকে কাত করিয়ে শুইয়ে রাখুন, মুখের মাংসপেশির নাড়াচাড়া যথাসম্ভব কম রাখতে হবে।

হাত ও পায়ের শিরা কেটে গেলে পরিষ্কার ও নরম কোনো কাপড় (গজ কাপড়ের মতো, লম্বা হলে ভালো হয়) যতটা সম্ভব চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। অঙ্গটিকে মাথার ওপরে তুলে রাখলে রক্তপাত কমে। বাঁধন দিলে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন বেশি জোরে না হয়; না হলে রক্ত চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে অঙ্গটি নষ্টও হতে যেতে পারে।

পেটের ভিতরে রক্তপাত হলে নাভির চারপাশে বা কোমরের কাছে বাদামি ছোপ দেখা যেতে পারে। পায়ের বা হাতের বড়ো হাড় ভেঙে রক্তপাত হলে অঙ্গটি খুব ফুলে যেতে পারে। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তখনই এই ধরনের রক্তচাপ বন্ধ করার বিশেষ উপায় নেই।

রক্তপাত বা আঘাতের স্থানে বরফ লাগালে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে রক্তপাত কিছুটা প্রশমিত হতে পারে।

আহত রোগীকে মুখে জল না খাওয়ানোই ভালো। শ্বাসনালিতে কোনো অসুবিধা থাকলে তা আরও বেড়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেতে পারে। মাথায় বড়ো ক্ষত থেকে রক্তপাত হলে বেশি চাপ দেওয়া যাবে না, ছোটো হাড়ের টুকরো ভেঙে ভিতরে চলে যেতে পারে। আলগা করে কাপড় জড়িয়ে রাখতে হবে।

জঙ্ঘার হাড় ভাঙলে কুঁচকির কাছে ধমনিতে চাপ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

যেগুলো খেয়াল রাখতে হবে

রক্তপাত বন্ধ করতে না পারলে বা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করলে মৃদু বা মাঝারি রক্তপাতও তীব্র বা অতি-তীব্র আকার নিতে পারে।

প্রতি ১০ মিনিট অন্তর রোগীর নাড়ি ও শ্বাস-এর গতি মাপতে হবে ও লিখে রাখতে পারলে খুব ভালো।

একবার দেওয়া ব্যান্ডেজ বারবার খুলে দেখার চেষ্টা কখনো করা উচিত নয়।

অঙ্গ (যেমন হাত বা পা) বেশি নাড়াচাড়া করলে রক্তপাত বন্ধ হতে দেরি হবে। সেক্ষেত্রে কোনো শক্ত কাঠ বা রড জাতীয় কিছু দিয়ে অঙ্গটিকে স্থির রাখতে হবে।

হাসপাতালে পৌঁছোনো

আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পেলেই সবচেয়ে ভালো, কিন্তু তার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করবেন না। এমন কোনো গাড়ি নিন যাতে রোগীকে যতটা সম্ভব চিত করে শুইয়ে রাখা যায়। হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে পৌঁছালেই উপস্থিত ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ি, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন ও দ্রুত শিরা ফুঁড়ে শিরার মধ্যে স্যালাইন চালাবেন। পাশাপাশি প্রয়োজন বুঝে কিছু রক্ত পরীক্ষার জন্যে পাঠাবেন—যেমন হিমোগ্লোবিন; এবং রোগীকে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। যদি সন্দেহ হয় যে পেটের মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তবে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবস্থা থাকলে তা করবেন ও রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে পেট কেটে রক্তপাতের উৎস ধমনিগুলোকে বন্ধ করবেন। নতুবা বাইরে দৃশ্যমান শিরা বা ধমনি এবং তারপর চামড়ায় সেলাই করে দেবেন। রোগী কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাকে সাধারণ ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেবেন।

পথ দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে গেলে

প্রায় যেকোনো দুর্ঘটনায় শরীরে জোরালো আঘাত লাগে, ফলে হাড় ভাঙা খুব স্বাভাবিক। শরীরের যেকোনো হাড়ই ভাঙতে পারে, তবে যেগুলো বেশি চিন্তার সেগুলো হল—শিরদাঁড়ার হাড়, মূলত ঘাড়ের শিরদাঁড়া, মাথার খুলির হাড়, কোমরের হাড়, জঙ্ঘা ও পায়ের হাড় এবং বাহু ও হাতের হাড়।

হাড় ভেঙেছে বুঝবেন কীভাবে?

আঘাতের সময় ভাঙার শব্দ পাওয়া যাবে। ভাঙা জায়গায় তীব্র যন্ত্রণা থাকবে। জায়গাটা খুব ফুলে যাবে, ও লাল হয়ে যেতে পারে। অঙ্গটিকে হয় নাড়ানো যাবে না বা অস্বাভাবিক নড়ন অনুভব করা যাবে। সবচেয়ে সহজে বোঝা যায় যদি দু-টি ভাঙা অংশকে একে অপরের সাপেক্ষে নাড়িয়ে দেখা যায়। কিন্তু এইভাবে পরীক্ষা করতে গেলে হাড়ের খোঁচায় শিরা বা ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,তাই এটি সর্বদা এড়িয়ে চলাই ভালো। অনেক সময় আঘাত এত বেশি হয় যে মাংসপেশি ও চামড়া ফুঁড়ে ভাঙা হাড় বেরিয়ে আসে ও ভাঙা অংশটি শরীর থেকে প্রায় আলাদা হয়ে যেতে পারে। প্রবল রক্তপাত তো থাকেই, তার সঙ্গে ক্ষতস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাবার জন্যে সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকে অনেক বেশি। অনেক সময় 'ক্র্যাশ ইনজুরি' হলে অর্থাৎ গাড়ির চাকা বা ভারী কোনো কিছু হাত বা পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলে চাপের প্রভাবে শিরা ধমনি চেপটে গিয়ে রক্তপাত প্রাথমিকভাবে কম হতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর এই ধরনের আঘাতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

যা করবেন

যদি দেখা যায় শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙেছে তবে রোগীকে কিছুতেই বেশি নাড়ানো যাবে না, এতে লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হবে। অন্তত ৫ জন লোক মিলে রোগীকে দুর্ঘটনার জায়গা থেকে পাশে একটি সুরক্ষিত স্থানে এমনভাবে ধরে নিয়ে আসতে হবে যাতে রোগীর সমস্ত শরীর এবং শিরদাঁড়া সোজা থাকে। রোগীর ঘাড়ের কাছে কোনো কাপড় এমনভাবে ভাঁজ করে রাখতে হবে যাতে শ্বাসনালি ও ঘাড়ের শিরদাঁড়া সোজা থাকে। পাশাপশি কোনো মোটা কম্বল জাতীয় কিছু, লম্বা কাঠের পাটা, মই, লোহার লম্বা রড জোগাড় করতে হবে যাতে রোগীকে সোজাভাবে চিত করে শুইয়ে রাখা যাবে ও বড়ো কাপড় বা দড়ির সাহায্যে রোগীকে তার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে। সম্ভব হলে রোগীকে ব্যথার ওষুধ মুখে খাওয়ানো যেতে পারে, যদি শ্বাসনালিতে কোনো অসুবিধা না থাকে। এই ধরনের রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স জাতীয় গাড়িই ভালো, অন্যথায় খেয়াল রাখতে হবে রোগীর শিরদাঁড়ায় যাতে আর চোট না লাগে।

যদি দেখা যায় হাত বা পায়ের হাড় ভেঙেছে কিন্তু চামড়া অক্ষত আছে, সেক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে বরফ লাগানো যেতে পারে। আগে যেমন বলা হয়েছে তেমন করে শক্ত কোনো কাঠ বা রড জোগাড় করে কাপড়ের সাহায্যে সেটিকে অঙ্গটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে যাতে ভাঙা জায়গায় নড়াচড়া না হয়।

যদি হাড় ভেঙে যায় ও হাড়ের ভাঙা মুখটি বাইরে বেরিয়ে আসে তবে ক্ষতস্থানটিকে যতটা সম্ভব হাত না লাগিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। শক্ত কাঠ জাতীয় কিছুর সাহায্যে স্প্লিন্ট বানিয়ে সেটি বেঁধে দিতে হবে যাতে নড়াচড়া না হয়। পাশাপাশি রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে পরিষ্কার কোনো কাপড় জড়িয়ে মোটা ড্রেসিং করতে হবে ও বরফ লাগাতে হবে। অঙ্গটিকে কিছুটা ওপরের দিকে তুলে রাখতে হবে।

যা করবেন না

কখনোই জোর করে ভাঙা হাড় দু-টিকে সমান করতে যাবেন না, এতে শিরা ও ধমনিতে আঘাত লেগে রক্তপাত বেড়ে যাবে।

স্প্লিন্ট বা স্ল্যাব জোগাড় করতে অযথা বেশি সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন হাড় ভাঙার জন্যে রোগীর অঙ্গ বিকল হতে পারে বা অঙ্গহানিও হতে পারে, কিন্তু দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে এনে স্যালাইন ও রক্ত দিতে না পারলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

শিরদাঁড়ায় চোট লাগা রোগীকে কোনো অবস্থাতেই দাঁড় করানো বা বসানো যাবে না।

হাসপাতালে পৌঁছোনো

হাসপাতালে আনার পর ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখবেন অভিঘাত বা শক-এর কোনো লক্ষণ আছে কিনা। দরকার মতো তিনি শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন চালাবেন, মাংসপেশিতে ব্যথার ইঞ্জেকশন দেবেন, ও এক্সরে করাবেন। হাড় ভাঙা ও রক্তপাতের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন যে বাইরে থেকেই অর্ধ-প্লাস্টার করবেন, না অপারেশন করবেন। সদ্য লাগা চোটে পূর্ণ প্লাস্টার করা হয় না, কেননা এতে আরও ফুলে গিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে অঙ্গটি পচে যেতে পারে—একে বলা হয় কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। অপারেশন করা হলে বেশিরভাগ সময় একটি সরু তারের সাহায্যে দু-টি হাড়ের টুকরোকে জোড়া লাগানো হয় বা কখনো কখনো একটি ধাতব রড হাড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেমন জঙ্ঘার হাড় বা ফিমার বোন। পায়ের হাড় সহজেই ভেঙে বাইরে চলে আসে, অপারেশন করতেই হয় এবং এক রকমের প্লেট বসানো হয়। হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলে বা অত্যধিক কোষকলার ক্ষতি হলে কিছু ক্ষেত্রে কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া (অ্যাম্পুটেশন) উপায় থাকে না। মাথার বা শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে গেলে সেখানে প্লাস্টার করার উপায় থাকে না—বিভিন্ন রকম স্প্লিন্ট, ট্র্যাকশন ইত্যাদি দেওয়া হয় ও রোগীকে দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রামে থাকতে হয়।

পরিশেষে, পথ দুর্ঘটনা একটি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যসৃষ্ট মহামারী: জন সচেতনতা, উন্নত রাস্তাঘাট ও ট্রাফিক ব্যবস্থা, ও উপযুক্ত আইন প্রণয়নই একমাত্র পারে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা, আরও বেশি অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধারকারী টিম গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের পথ দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাঁচাতে পারে অনেক মূল্যবান প্রাণ।

ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

চেনা ওষুধ অজানা কথা

এলবেন্ডাজোল (Albendazole)

এলবেন্ডাজোল-এর নামটা আমাদের সবার জানা। কৃমির ওষুধ—গোল কৃমি (round-worms), অঙ্কুশ কৃমি (hookworms), সুতো কৃমি (threadworms), চাবুক কৃমি (whipworms), পিন কৃমি (pinworms)-র জন্য এই ওষুধ সাধারণত ব্যবহার করা হয়। ফিতে কৃমির (গোরু, শুয়োর এবং কুকুর থেকে হওয়া) জন্যও ব্যবহার করা হয় এলবেন্ডাজোল।

এলবেন্ডাজোল বাজারে পাওয়া যায় বড়ি আর সাসপেনশন রূপে। বড়ি—৪০০ মিলিগ্রামের, অনেক সময় এই বড়ি চিবিয়েও খাওয়া হয়। আর সাসপেনশনের প্রতি ৫ মিলিলিটারে থাকে ২০০ মিলিগ্রাম ওষুধ।

গোল কৃমি, অঙ্কুশ কৃমি, সুতো কৃমি, চাবুক কৃমি, প্রভৃতিতে প্রাপ্তবয়স্ক ও ২ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের ৪০০ মিলিগ্রাম একবার দেওয়া হয়। ১ থেকে ২ বছর বয়সি শিশুদের দেওয়া হয় ২০০ মিলিগ্রাম।

ট্রাইচুরিয়াসিস কৃমি সংক্রমণে প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ বছরের বড়ো শিশুদের ক্ষেত্রে মাঝারি সংক্রমণে একবার ৪০০ মিলিগ্রাম আর প্রবল সংক্রমণে প্রতিদিন ৪০০ মিলিগ্রাম করে মোট তিনদিন। ১ থেকে ২ বছর বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে মাঝারি সংক্রমণে একবার ২০০ মিলিগ্রাম আর প্রবল সংক্রমণে প্রতিদিন ২০০ মিলিগ্রাম করে মোট তিনদিন।

স্ট্রংগিলয়ডিয়াসিসে প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ বছরের বড়ো শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৪০০ মিলিগ্রাম করে মোট তিনদিন।

গর্ভাবস্থায় এলবেন্ডাজোল খাওয়া নিষিদ্ধ। এলবেন্ডাজোল খাওয়ার এক মাসের মধ্যে গর্ভবতী না হওয়া ভালো। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়ও এলবেন্ডাজোল না খাওয়া উচিত। ১ বছরের কম বয়সি বাচ্চাদের এলবেন্ডাজোল দেওয়া যায় না।

এলবেন্ডাজোলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব একটা হয় না বললেই চলে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব হতে পারে—

- পেটে ব্যথা
- বমি ভাব-বমি
- মাথাব্যথা
- মাথা ঝিমঝিম করা
- চুল ওঠা, ওষুধ বন্ধ করার পর অবশ্য সাধারণত চুল গজায়।

কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিন্তু গুরুতরও হতে পারে। এসব হলে অবিলম্বে ডাক্তারি সহায়তা নিন।

- গলাব্যথা, জ্বর, কাঁপুনি
- অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা কালশিটে পড়া
- দুর্বলতা
- ক্লান্তি
- চামড়া ফ্যাকাশে
- শ্বাসকষ্ট
- চামড়ায় ফুসকুড়ি
- আমবাত

এলবেন্ডাজোল বাচ্চার হাতের নাগালের বাইরে রাখুন। অতিরিক্ত গরম বা আর্দ্রতায় রাখা যাবে না, রাখুন ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে।

নতুন আলোকে অবাধ মার্কসবাদ চর্চার একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

(নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *মান্থলি রিভিয়ু*-র বাংলা সংস্করণ)

প্রতিসংখ্যা পঞ্চাশ টাকা

বর্তমান সংখ্যার বিষয়বস্তু

যোগাযোগ:৯৪৭৭৪৩৩৩৫২,৯৮৩০৮৪৭১৫৯

- আধুনিক কৃষি বিষয়ে মার্কসের সমালোচনার বিকাশপথ; তার বাস্তুতান্ত্রিক অন্তর্দৃষ্টি
- নিও-লিবারেলিজম-এর মডেল—বাংলাদেশ মাইক্রোফিন্যান্স আর এনজিও-দের কাজকারবার
- সমাজতন্ত্রের কণ্ঠস্বর; কার্ল মার্কস
- অকুপাই আন্দোলন কী?

আপ্যায়নেই না, শরীর সুস্থ রাখতেও চা খান

উনিশ শতকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, 'চা-পান না বিষপান'। মানুষকে চা-পান থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তারপর থেকে চায়ের জল অনেকদূর গড়িয়েছে। জানা যাচ্ছে নানা রকম চায়ের নানা উপকারিতা। কোন চা কীভাবে তৈরি করে পান করলে কী কী রোগের প্রকোপ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়—এসব কথা বিশদে জানাচ্ছেন **অনন্যা মণ্ডল।**

এইই-চা য়ে . . . গরম চা য়ে . . .। ও ভোলাদা . . . এদিকে ৩টে ছোটো ভাঁড়ে। ওগো শুনছো আরেক কাপ হবে গো . . . লিকার-ই দিও . . .। চা নিয়ে হরেক হাঁক-ডাকে মুখরিত আপনার-আমার সারাটা দিন। চলন্ত ট্রেনের শশব্যস্ত কামরা হোক বা ছুটির আমেজঘন বৈঠকখানা—এক পাত্র চায়ে যেন টলটল করে অফুরান প্রাণশক্তি আর ফুরফুরে মেজাজ।

চা—শুধু মাত্র একটি পানীয়ই নয়; বিশ্ব মানবের রোজনামচায় চা-এর সঙ্গে সে যেন এক নাড়ির যোগ—এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। চা-পানের জন্য কোনো স্থান, কাল বা পাত্রের বাহানার প্রয়োজন পড়ে না—নাম মাহাত্ম্যেই সে সদাসীন ও সর্বব্যাপী। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—Everytime is teatime। চা আসলে মানবজীবনের এক ঐতিহ্য—এক পেয়ালা উষ্ণ অনুভূতি। পানীয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রাণদায়ী জল-এর ঠিক পরেই চা-এর স্থান।

হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের দেশগুলিতে চা নামক পানীয়টিকে নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। প্রাচ্যের মানুষরা অনেকেই চা-কে সুস্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জ্ঞানের চাবিকাঠি হিসাবে গণ্য করে। অতিথিকে চা দিয়ে অভ্যর্থনা করার রীতি সর্বত্রই এবং এটি একাধারে অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করাও বটে। এ তো গেল রীতি-রেওয়াজের কথা। এবার আসুন, বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চা-এর চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, এই মহার্ঘ পানীয়টির গুরুত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

রোগপ্রতিরোধ ও নানা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় চা-এর যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা না মেনে উপায় নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, কয়েক ধরনের চা ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিস কমানোর ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা নেয়। ওজন কমানো, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো ও মানসিক সক্রিয়তাবৃদ্ধিতে চা-এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া চা-এর অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণাগুণও আছে।

অনেক ধরনের পাতার নির্যাস থেকে প্রাপ্তব্য পানীয়র সমষ্টিগত সাধারণ নাম চা হলেও, বিশুদ্ধবাদীদের কাছে শুধুমাত্র গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি, হোয়াইট টি ও ওলং টি চা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এই সকল প্রকার চা-এর উৎপত্তি ক্যামেলিয়া সিনেনসিস *(Camellia sinensis)* নামক এক প্রকার গুল্ম থেকে যা মূলত ভারত ও চীনদেশে উৎপন্ন হয়। এই গুল্ম ফ্ল্যাভোনোয়েড নামক একপ্রকার চমৎকার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ধারণ করে। যেমন মনে করুন, আপনার বাড়িতে লোহার তৈরি আসবাবপত্রগুলিকে মরচে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে আপনি Rust-Oleum paint ব্যবহার করলেন; অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলির ব্যাপারটা ঠিক তেমনটাই, এরা আপনার দেহকে বয়সজনিত স্বাভাবিক ক্ষয় ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও শক্তিশালী হল ECGC যা ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি কমানোর ব্যাপারে সাহায্য করে। এই জাতীয় অতি প্রচলিত চা-গুলির মধ্যে ক্যাফেন (Caffeine) ও থিয়ানিন (Theanine) উপস্থিত যা মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানসিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

চা পাতাগুলি যত বেশি প্রসেসিং করা হয়, তাদের মধ্যে পলিফেনলগুলির মাত্রা তত কমতে থাকে। ফ্ল্যাভোনোয়েডও কিন্তু পলিফেনল গ্রুপের অন্তর্গত। চা পাতাকে জারিত বা পাচিত করে ব্ল্যাক টি এবং ওলং টি তৈরি হয়, তাই এই দু-প্রকার চা-তে গ্রিন টি অপেক্ষা কম মাত্রায় পলিফেনল থাকে। সত্যি বলতে কি, প্রত্যেক প্রকার চা-এর নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বাদ, সুবাস ও উপকারিতা ভিন্ন ভিন্ন। এবার প্রচলিত চা-গুলির প্রত্যেকটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

➢ **গ্রিন টি**: চা সমাজে ইনি হলেন সর্বপেক্ষা কুলীন এবং সবচেয়ে বেশি উপকারী; বিশেষত যারা ওজন কমানোর ব্যাপারে আগ্রহী, তাদের কাছে এর কোনো বিকল্প হয় না। স্টিমড বা ফোটানো চা-এর পাতা থেকে

গ্রিন টি তৈরি হয়। এতে উচ্চ মাত্রায় ECGC ও ক্যাটেচিন (Catechins) বর্তমান। এই চা-তে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ব্লাডার, ব্রেস্ট, লাং, স্টম্যাক, প্যানক্রিয়াটিক ও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের বৃদ্ধি কমাতে সাহায্য করে, ধমনির মধ্যে রক্তচলাচল ব্যাহত হওয়া এবং মস্তিষ্কে অক্সিডেটিভ ট্রেসকে প্রতিরোধ করে, এরা অ্যালজাইমার ও পার্কিনসন্স জাতীয় স্নায়ুঘটিত রোগ ও স্ট্রোক-এর সম্ভাবনা কমায় এবং রক্তে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা সঠিক রাখতেও সাহায্য করে। তাজা বা সতেজ গ্রিন টি স্বাদে সামান্য মিষ্টি বা অল্প পরিমাণে বাদামের স্বাদযুক্ত হতে পারে, তবে ঠিকমতো তৈরি করতে পারলে কখনোই তেঁতো স্বাদযুক্ত হয় না।

➢ **ব্ল্যাক টি:** জারিত বা পচিত চায়ে-র পাতা থেকে এই জাতীয় চা প্রস্তুত করা হয় এবং চা-প্রেমীদের মধ্যে এর বিপুল সমাদর। ব্ল্যাক টি-তে উচ্চ মাত্রায় (৫০%-৬৫%) ক্যাফেন থাকে এবং এটি বিবিধ গন্ধযুক্ত চা-এর মূল উৎস। সমীক্ষায় প্রমাণিত যে ধূমপানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসের সুরক্ষায় এই জাতীয় চা কিছুটা কার্যকরী। ব্ল্যাক টি-ও স্ট্রোক-এর সম্ভাবনা কমায়। এতে থিয়াফ্লাভিন (Theaflavins) ও থিয়ারুবিজিন্স (Thearubigins) নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উচ্চমাত্রায় থাকে যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ব্ল্যাক টি-এর অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল গুণাগুণও আছে।

➢ **হোয়াইট টি:** অজারিত চায়ের পাতা থেকে এই প্রকার চা-এর উৎপত্তি। চা-এর জগতে সব চাইতে সুস্বাদু এই সফেদ চায়ে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে যে, প্রসেস করা চা অপেক্ষা এই হোয়াইট টি-র বেশি ক্যান্সাররোধী গুণাগুণ রয়েছে। হোয়াইট টি সুগন্ধী এবং মিষ্টি স্বাদের।

বাজারে চালু 'ইন্সট্যান্ট টি'গুলিতে প্রকৃত চায়ের গুণাগুণ খুবই অল্প পরিমাণে বর্তমান এবং এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও আর্টিফিশিয়াল সুইটনার থাকে। এই জাতীয় চা পান করার আগে এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যের খাতিরে—কী কী উপাদানে এই চা প্রস্তুত তা লেবেলে ভালো করে দেখে কেনা উচিত। উপরে লিখিত সমস্তরকম চায়ের ক্ষেত্রেই চিনি, দুধ ছাড়া শুধুমাত্র লিকার চায়ের কথাই বলা হয়েছে। কারণ চিনি, দুধ ও চা পাতার মিশ্রণে যে পানীয় তৈরি হয়, তার গুণাগুণ প্রকৃত চা অপেক্ষা অনেকটাই কমে যায় এবং চা পাতায় উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কার্যকারিতাও কমে যায়।

দু-টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চায়ে উপস্থিত ক্যাফেন-এর মাত্রা বা পরিমাণকে প্রভাবিত করে, তা হল—চা ফোটানোর জলের তাপমাত্রা এবং কতক্ষণ ধরে চা পাতা জলে ভেজানো হয়েছে। কম তাপমাত্রায় জলে চা পাতা ফোটালে বা কম সময় ধরে চা পাতা ভিজিয়ে রাখলে, তার থেকে কম পরিমাণে ক্যাফেন নির্গত হয়।

মনে রাখবেন, আমাদের দেশে অনেকেই দিনে চার-পাঁচবারের বেশি চা খান। কিন্তু এদেশে রক্তাল্পতার প্রকোপ খুব বেশি, এবং অনেকক্ষেত্রেই এই রক্তাল্পতার কারণ হল লোহার অভাব। চায়ে যে ট্যানিন থাকে, তা খাদ্যে উপস্থিত লোহাকে শরীরে শোষণ হতে বাধা দেয়। সুতরাং আয়রনযুক্ত খাবার গ্রহণের পরেই চা খেলে এইধরনের রক্তাল্পতা বাড়তে পারে। এ ছাড়াও চায়ের ট্যানিন ক্যালশিয়াম শোষণেও বাধা দেয়। ক্যালশিয়ামের অভাবে আমাদের অস্থিগঠন ও অন্য কিছু বিপাকীয় কাজ ব্যাহত হয়। চা পানের উপকারিতা বিচার করার পাশাপাশি এ-দুটো কথা মনে রাখা জরুরি।

চা আসলে একটি উদ্দীপক মাত্র যা সাময়িকভাবে চাঙ্গা করে ও এক অতিসক্রিয় অনুভূতি প্রদান করে। খেয়াল রাখবেন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় চা পান করা মানেই খিদের অনুভূতিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা। এর ফলে খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ অনেক কমে যায় এবং দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন, চটজলদি ক্লান্তির শিকার হয়।

চা পান মূলত একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি মাত্র আর সেই কারণে রোজই ভালো মানের ও মিশ্রণের চা পান করুন। তবে যেকোনো চা, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন বা হলেই হল—এই জাতীয় একবগ্গা ভাবনা, মোটে ভালো কাজ না . . .।

অনন্যা মণ্ডল, এমএসসি (অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন), পিজিডি এসএস, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

এক হৃদ্‌রোগীর গপ্‌পো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু . . .

তা বছর পনেরো হয়ে গেল। ২০০০ সালে আমার হৃদয়ে জোর ধাক্কা। না, কোনো মন ভাঙাভাঙি, মান-অভিমানের পালা নয়। আসলে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা, হার্ট অ্যাটাক। কয়েকদিন ধরে ভুগছিলাম সর্দি-কাশিতে। ভয়ানক কাশি, দমকে দমকে কাশি। কাশির জেরে আমার হাড়পাঁজরা চুরমার হয়ে যাওয়ার জোগাড়। স্থানীয় ডাক্তারবাবু দেখে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন; ওষুধ খাচ্ছি। এক সন্ধ্যায় ওইরকম কাশছি আর ভাবছি এর পরের কাশিতে আর বোধহয় যেতে পারব না। পাঁজর ভেঙে বুকের ভিতরটাই বুঝি এবার বেরিয়ে আসে।

হঠাৎই আমার বুকের ভেতর অদ্ভুত ধরনের কী সব হচ্ছে টের পেতে থাকলাম। অদ্ভুত বলছি কেননা এ-ধরনের কোনো অনুভূতি শরীরে এর আগে কোনোদিন আমি টের পাইনি। স্টারনাম*-এর বাঁ-পাশ ধরে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো চিড়িক-চিড়িক একটা যন্ত্রণা; হতে-না-হতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর মনে হতে লাগল বুকটা কে যেন চেপে ধরেছে; দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। এরপর শুরু বুকের বাঁ-দিক জুড়ে যন্ত্রণা। এটা আর মিলিয়ে যাচ্ছে না বরং ছড়িয়ে পড়ছে বাঁ-হাতের দিকে। এমন সময়ে বেগ পেয়ে গেল। টয়লেটে গিয়ে কতটুকু কী হল-না-হল মনে নেই। তবে ঘামতে শুরু করলাম—মনে হল কে যেন আমার ঘাড় ফুটো করে একটা কল লাগিয়ে দিয়েছে আর তা থেকে পাহাড়ি ঝরনার মতো জল অবিরল ধারায় আমার পিঠ বেয়ে ঝরে পড়ছে। ঘাম না বলে একে ধারাস্নান বলাই বুঝি সঙ্গত। কোনোমতে ফিরে এলাম। মাথা কেমন টালমাটাল, এলোমেলো। বাঁ-হাতের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে—মনে হচ্ছে ট্রাইসেপস-পেশিগুলো কে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে চলেছে; চলেছে তো চলেইছে, থামাথামি নেই কোনো। একই সঙ্গে চোয়াল দু-টো কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে; মুখ নাড়াতে পারছি না। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়তে থাকলাম। ঘরে তখন বহু লোকের ভিড়। তারা কথা বলছে; আমি শুনছি যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা স্বর। এক খুব কাছের প্রতিবেশীর মা শুনেটুনে একটা সরবিট্রেট পাঠিয়ে দিলেন। জিভের তলায় রাখলাম॥ ডাক্তারবাবু এসে তক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাতে বললেন। হাসপাতাল না হাতের কাছে কোনো নার্সিংহোম—এ নিয়ে ঘরে বিতণ্ডা যখন তুঙ্গে, ওই অবস্থার মধ্যেই আমি মিনমিন করে (তখনও জ্ঞান হারাইনি) বললাম, হাসপাতালেই নিয়ে চলো। গেলাম কলকাতার সব থেকে নামি

সরকারি হাসপাতালে। ওরা একটুও সময় নষ্ট না করে আমাকে একটা ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে দিলেন, স্ট্রেপটোকাইনেজ। ডাক্তারদের ভাষায় থ্রম্‌বোলাইজ করা। তখন অবশ্য আমার চেতনা ছিল না। প্রাণে বেঁচে গেলাম। পরে শুনেছি, আর পনেরো-বিশ মিনিটের হেরফেরে আমার আর ঘরে ফেরা হত না। আর ওই সরবিট্রেট-এর জন্যই ডাক্তাররা চিকিৎসার সময়টুকু পেয়েছিলেন, নচেৎ ওঁদের নাকি কিছু করবার ছিল না। ওঁরা বলেছিলেন, আমার যা হয়েছিল তার নাম ইনফেরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

পরদিন সকাল। মাথাটা কেমন এলোমেলো—এইটুকুই যা, আর সব তো মনে হল ঠিকই আছে। বিশাল ওয়ার্ডে সাতসকালে হাজির কাগজের হকার। দু-খানা কাগজ কিনে, পড়তে শুরু করলাম। কোত্থেকে একজন সিস্টার এসে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে কাগজ কেড়ে নিলেন, সঙ্গে এক ধমক, 'কে বলেছে আপনাকে পড়তে?' কাগজগুলো নিয়ে নিলেন। আমি তো হাঁ! পড়তে মানা—কে জানে বাবা! খানিকবাদে চটি গলিয়ে বাথরুম যাচ্ছি। দু-চার পা হাঁটতেই-না-হাঁটতেই আর একজন হাঁ হাঁ করে এসে পড়লেন, 'কোথায় যাচ্ছেন? বেডে চলুন, যা করবার বেডে বসেই করতে হবে; নট নড়নচড়ন।' বললাম, কথা বলব? উত্তর এল 'স্পিকটি নট!' এ কোন 'অলির আজব দেশে' এসে পড়লাম রে বাবা!

নার্স দিদিমণিরা অনেকেই কেমন খটখটে। সুযোগ পেলেই ধমকধামক, কথা প্রায় কানেই তোলেন না। মনে ভাবি, করবেনই-বা কী। বিশাল ওয়ার্ডে অগুন্তি রোগী। গুনে দেখিনি তবে ৮০-৯০ জন তো হবেই। সব সময়ে ডিউটিতে দু থেকে তিনজন মাত্র নার্স। এতগুলো মুমূর্ষু রোগীকে কী করেই বা তাঁরা সামলাবেন। তাই হয়তো দিনে দিনে অমন কর্কশ আচারব্যাভার হয়ে উঠেছে। এক রাতে ওঁদেরই এক অন্য মূর্তি দেখলাম। এক রোগী হঠাৎই রক্তবমি করা শুরু করল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বেড। ওঁরা ঝাঁপিয়ে

* স্টারনাম শব্দটা আগে হয়তো বায়োলজিতে পড়েছি। যখন যন্ত্রণাটা হচ্ছিল তখন তো আর মনে ছিল না। পরে ডাক্তারবাবুদের থেকে জেনেছি; যন্ত্রণা ঠিক কোথায় হচ্ছে বোঝাতে শব্দটার প্রয়োগ সুবিধাজনক। তাই লিখলাম। স্টারনাম হল বুকের ঠিক মাঝখানটায় চ্যাপটা হাড়টার নাম।

পড়লেন। ফোনাফুনি করে ডেকে নিলেন ডাক্তারদের। তারপর সারারাত ডাক্তার নার্স মিলে কত কী যে করলেন, তার আমি কীই-বা বুঝি। ঘুমোতে পারিনি। আমার মতো অনেকেই জেগে। সকলের মনে চারিয়ে যাচ্ছিল, যেন-বা সংক্রামিত হচ্ছিল একটা মরোমরো মানুষকে প্রাণে ফিরিয়ে আনার এই প্রায়-অসম্ভব অক্লান্ত প্রয়াস। ওঁরা পারলেন, ভোরের দিকে রোগীর বিপদ কাটল। মানুষের উপর টলে যাওয়া বিশ্বাসকে ফিরে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আর ওই নাম-না-জানা জীবন-সেনাদের কুর্নিশ না জানিয়ে আমার কি উপায় ছিল কোনো!

গাঁজাখোরদের গল্পটা তো সবাই জানেন। আমরাও তেমনি 'রতনে রতন' বা 'অন্য কিছু' চেনার মতো করে নেশাড়ুদের রীতিমতো একটা দল পাকিয়ে ফেললাম। মদত দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন বেশ কিছু হাসপাতাল-কর্মী। ফলে বিকালে দেখা-সাক্ষাৎ পর্ব শেষ হওয়ার পরেই চলত আমাদের সান্ধ্য অভিসার। আমার তো গোঁফ গজানোর আগেই 'ধূম লেগেছে হৃদ্‌কমলে'। একজন একটু বেশি বেপরোয়া। ওয়ার্ডের মধ্যেই লুকিয়ে দেশলাই-সিগারেট নিয়ে আসতেন। একদিন বামাল ধরা পড়ে গেলেন জাঁদরেল এক সিস্টারের হাতে। কোনো এক বেসরকারি সংস্থার অফিসার, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সি মানুষটির মুখখানা হয়েছিল দেখবার মতো।

আর এক দাপুটে মানুষের কথা মনে পড়লে এখনও তাজ্জব বনে যাই। তিনি ওই খিদিরপুরের দিকে কয়েকটি থানার সার্কল ইন্সপেক্টর। বাঁজখাই গলায় হাঁকডাক করে কথা বলা তার দস্তুর। যাঁরা তাঁকে দেখতে আসেন, বাড়ির লোকজন, থানার অধস্তন কর্মীরা, সব তটস্থ। এমনকী হাসপাতাল-কর্মীরাও তাঁকে একটু সমঝে চলেন। এহেন মানুষটিকে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করবেন পরের দিন। ব্যাস্, সেই যে কান্না শুরু হল, থামেই না আর, একেবারে ঘ্যানঘ্যানে বাচ্চাদের মতো কান্নাভেজা আবদার; 'আমি ওটা করবই না, কিছুতেই না।' ওঁর স্বজন, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আমরা কয়েকজন রোগীও অনেক করে ওঁকে বোঝালাম। নিমরাজি হলেন বটে কিন্তু সারারাত চলল ফোঁপানি।

পরদিন অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফির পর তাঁকে বেড়ে দেওয়া হল। ওই সময়ে এই পরীক্ষার পর পা-টা বিশমণ পাথরের মতো ভারী হয়ে যেত; এমনকী পায়ের আঙুলও নাড়ানো যেত না; এই দশাটা থাকত প্রায় বারো ঘণ্টা। স্বাভাবিক হতে একদিন লেগে যেত। বেড়ে শুয়েই তিনি হাত-পা ছুঁড়ে (যদিও ডান পা-টা একচুলও নাড়াতে পারছিলেন না।) চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, 'আমি আর বাঁচব না, নির্ঘাৎ মরে যাব; ও দাসবাবু, ইমতিয়াজ ভাই, গাঙ্গুলীবাবু—আপনারা আমাকে বাঁচান।' থামানো যাচ্ছে না তাঁকে কোনোমতেই। দাসবাবু কষে এক ধমক লাগালেন, 'চুপ করবেন কি না আপনি! আপনার থানা-এলাকার চোর-ছ্যাঁচোর, গুণ্ডা-বদমাশরা যদি আপনাকে এমন ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখে—তারা আর আপনাকে মানবে কোনোদিন, মাথায় চাঁটি মারবে।' ধমকে বোধ হয় একটু কাজ হয়েছিল।

এরপর মনে পড়ে হাসপাতালের নোংরা-জঞ্জাল। হাসপাতালের 'নোংরা আর নোংরামি' নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, লেখাও হয়েছে বিস্তর। আমি শুধু ভাবি, এ ব্যাপারে সরকার নামে এক বিমূর্ত কর্তৃত্বের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে আমরা কেমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। অথচ হাসপাতাল এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যেসব স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব (তারজন্যই তাঁরা মাইনে পান) তাঁরা তো কেউ আকাশ থেকে পড়েন না—আমাদেরই সমাজে, আমাদের আত্মীয়স্বজন, পড়শি তাঁরা। আর রোগীর স্বজনবর্গও কি কিছু কম যান হাসপাতাল চত্বরকে এক নরককুণ্ড বানিয়ে তোলার প্রতিযোগিতায়! যে মানুষজন ভারত নামক ভূখণ্ডকে পৃথিবীর 'বৃহত্তম প্রস্রাবাগার ও শৌচালয়' বানিয়ে তুলে 'অষ্টম আশ্চর্যের' দাবিদার, তাদের থেকে আর কী আশা করা যায়। এই সেদিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলাম। গোটা হাসপাতাল জুড়ে 'উন্নয়ন-নির্মাণকাজ' চলেছে। ইট বালি সিমেন্টে, ভাঙা ঘরবাড়ির অবশেষে গোটা চত্বর ধুলোয় ধুলোময়। ক্যাজুয়ালটি-বিভাগের সামনে নাক-মুখ ঢেকেও হাঁটা যায় না। এ পরিবেশে সুস্থ মানুষেরই তো অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা; রোগীদের কী হাল হতে পারে একবার ভাবুন। স্বাস্থ্য আন্দোলনের সব স্তরের কর্মীদেরই ভেবে দেখতে অনুরোধ করি—কোন পথে, হাসপাতাল সাফাই কাজে কীভাবে সমাজের সবাইকে শামিল করা যায়।

আর একটা কথা মনে পড়ছে, যাঁদেরই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগটাই যেন আধমরা হয়ে আছেন। মুখে ধরতাই বুলি একটাই—আর কী, হয়ে এল। যেন ফাঁসির আসামী; ফাঁসিকাঠে ঝোলার অপেক্ষায় দিন গুনছেন—শুধু দিনক্ষণ স্থির করা নেই, এই যা ফারাক। পরে দেখেছি এঁদের অনেককেই মনশ্চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। মৃত্যুভয় এভাবে মানুষকে চেপে ধরে হৃদয়ে ঘা না খেলে কোনোদিনই হয়তো এমন উপলব্ধি আমার হত না।

দিন সাত-আট কেটে গেল। প্রায় ঘরবাড়িই বানিয়ে ফেলেছিলাম হাসপাতালটাকে। যা ইচ্ছে তাই করতাম; একা একা নয়, দল পাকিয়ে। ডাক্তার-নার্সদের নির্দেশ না-মানার মধ্যেই যেন তুরীয় আনন্দ। এর মধ্যে বড়ো ডাক্তারবাবু এসে বললেন, আপনার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করতে হবে। আমি তো হাঁ। 'সে তো অনেক খরচের ব্যাপার, টাকাকড়ি আমার কিছুই জমানো নেই; হবে না ডাক্তারবাবু। ওষুধে রাখতে পারলে রাখুন।' তিনি 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললেন না। ওষুধ লিখে ছুটি দিয়ে দিলেন। পরের মাসে চেক-আপের জন্য আসতে বললেন। হাসপাতালে সবমিলিয়ে খরচ হয়েছিল ষাট টাকার মতো, অবশ্য ইঞ্জেকশনটার দাম বাদে। ঠিক মনে নেই, ওর জন্য বোধ হয় হাজার তিনেক টাকা লেগেছিল। ওই একমাস প্রায় 'পুজোআচ্চা' করার মতো নিষ্ঠা নিয়ে ওষুধবিষুধ খেলাম; বিড়ি-সিগারেটটা আর ফুঁকলাম না। পরের মাসে আউটডোরে গিয়ে দেখি, ওরে বাবা, এ যে শিয়ালদা স্টেশনের মিনি সংস্করণ। তবু ঠেলেঠুলে লাইন দিলাম টিকিট করার জন্য। কিন্তু 'বেলাইনেই আছি বাবারা' তো আছেন। তারা কেমন টকাটক টিকিট কেটে ফেলছেন। আমরা 'হাঁ-করারা' দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। যাহোক, একটা ইসিজি হল, বড়ো ডাক্তারবাবু এলেনই না; যাঁরা কেবল ইসিজি-টা দেখলেন আমাকে নয়, তাঁরা ইনটার্ন, না হাউস-স্টাফ, না জুনিয়র ডাক্তার, তা আমি কী করে বুঝব। ওষুধ নিয়ে চলে এলাম। এরকম চলল মাস কতক। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, রোগী হিসেবে আমিও এককাঠি সরেস। সুতরাং ওষুধ খাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়ল; শেষে ছেড়েই দিলাম। ফোঁকাফুঁকিও চলতে লাগল লুকিয়েচুরিয়ে। ধাক্কাটা তো সামলে নিয়েছি—আর কী চাই। ছেড়েই দিলাম হাসপাতাল যাওয়া।

দ্বিতীয় পর্ব

রোগী-ডাক্তারে কোলাকুলি

হাসপাতাল-পর্ব শেষ হতে মুষিক যেন সিংহ হয়ে উঠল। অন্তরে-বাহিরে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। ওষুধবিষুধের ল্যাটা তো কবেই চুকিয়ে দিয়েছি। খাওয়া-দাওয়া পরিমাণে কম বটে তবে বাছবিচার নেই কোনো। আর ওই-যে ঘণ্টাখানেক হাঁটাচলার পরামর্শ—আরে 'পিপোফিশো'*-র সাক্ষাৎ চেলা আমি, এক-পা হাঁটতেই পা বিশমণ; ও সব ধকল কি আমি নিতে পারি! তাই বিছানায় ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে আঙুল নাচাচ্ছি—তোফা আছি। বাড়ির হিটলারনির চোপা, ডাক্তারবন্ধুদের সুপরামর্শ স্রেফ কানে ঢুকিয়ে কোথা দিয়ে যে বার করে দিচ্ছি, নিজেও ভালোমতো ঠাহর করতে পারি না।

এত অনাচার 'ধম্‌মে' সয়! ২০০২-এ আবার একদিন। বুক, বাঁ-হাত জুড়ে যন্ত্রণা। তবে আগের মতো অতটা নয়। এলাকার এক ডাক্তারবাবু (এম ডি, কার্ডিয়োলাজিতে ডিপ্লোমা) এলেন। তিনিও একটা ইঞ্জেকশন দিলেন, তবে স্ট্রেপটোকাইনেজ নয়। বললেন, 'এটা অ্যান্‌জাইনা পেইন; অ্যান্‌জাইনা পেক্‌টোরিস্‌।' হাসপাতালের ব্যবস্থাপত্র দেখে বললেন, 'ওষুধ খান তো?' কবুল করতেই হল—ডাক্তার-মোক্তারকে কি কেউ মিছে কথা বলে! আরও বললেন, 'অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফিটা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন?' মৌন রইলাম। একটু অসহিষ্ণুতা গলায় মিশিয়ে বললেন, 'আপনারা, যাঁরা বোঝেন তাঁরা যদি এমন অযৌক্তিক আচরণ করেন, তবে অন্যদের কী বলব?' যা হোক ঢোঁক গিলে তাঁর তেতো কথা আর ওষুধ গিললাম মাস কতক।

এই সময়ে হঠাৎ করেই চাপ বেড়ে কয়েক গুণ। খুলে বলি, আমাদের (যারা, সব 'বই-করিয়ে') সারাদিন কাটাকুটি খেলার পর হাতে থাকে গোল্লা। যা জোটে তাতে দিন-গুজরান (মাঝারিদের মানে) খুবই কষ্টের। তাই সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নিতে হয়। চোখের মাথা খেয়ে, বইগুলোর বারোটা বাজিয়ে বাজারে যখন বেরোয় তখন পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যে ঝরঝরে হয়ে উঠবে—এতে কেউ কি কোনো সন্দেহ করতে পারে! আমরা নাচার, কেননা দু-মুঠো জোটাতে হবে। ওইরকম করে এক প্রকাশকের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের অনুমোদনের জন্য (টেক্সট বুক নাম্বার পাওয়া) প্রায় পয়ঁতিরিশটি বইয়ের কাজ হাতে নিলাম। ২০০৩ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে বইগুলো করে পর্ষদে এবং সংসদে নির্দিষ্ট তারিখে-তারিখে ধাপে ধাপে জমা দিতে হবে। শুরু হল খাটুনি-পর্ব। সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত দু-টো। কখনো-বা কলেজ স্ট্রিটেই রাত কাটাই—দু-দিন,সাত দিন, পনেরো দিন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই এক হাতে। বিনিময়ে দু-মুঠো জুটে যায় এইমাত্র। তবে প্রকাশক আমার জন্য একটা সবসময়ের গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বলি, 'গাড়ি আমার লাগবে না, ও-টাকাটা তো আমাকে দিলেই পারেন।' তিনি বললেন, 'প্রবীর, আপনার শরীরের যা অবস্থা, কোনোরকম ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। গাড়ি না-নিয়ে এত দৌড়ঝাঁপ আপনি পারবেন না।' তিনি দূরদর্শী ছিলেন।

লেখকের পিছনে ছুটছি। লেখা কাটছি। অনেকটাই নিজে বকলমে ফের লিখে দিচ্ছি। অক্ষরবিন্যাস, পত্রবিন্যাস, চিত্রসংগ্রহ, বাছাই, প্রুফ সংশোধন কোনটা না করছি। তার মধ্যে নিজেই লিখছি পাঁচ-ছ-খানা বই। কাগজ বাছাই, কেনা, প্রেস ঠিক করা, ছাপার কাজ দেখা, বাঁধাইওয়ালাকে কাজ বোঝানো—সব করতে হচ্ছে প্রায় 'একা কুম্ভের' মতো। নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সব চৌপাট। মাথাটা যেন কেমন নিরেট হয়ে পড়ছে, ঢুকছে না কোনোকিছুই। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়েই চলেছি—ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, চোখ জ্বালা করছে; বুদ্ধি কিন্তু খুলছে না। শরীরও আর 'মহাশয়' হয়ে থাকতে চাইছে না, বেগড়বাই করছে। হাঁপ ধরছে, সিঁড়ি ভাঙতে প্রাণান্ত। একটু হাঁটাহাঁটি হলে বুকে চিনচিন। তার উপর টেনশন—বুক গুড়গুড়; সময়মতো সব ক-টা বই জমা করা যাবে তো!

এই রকম সময়ে এক মজাদার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ। সেটাও একটা গপ্‌পো—তবে তা এখন থাক। তাঁকে বললাম, 'অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি হবে না, কাঁটাছেড়া চলবে না; আমার অত টাকাপয়সা নেই। অন্যভাবে রাখতে পারেন কিনা দেখুন। আর হ্যাঁ, 'ফি' কিন্তু নিতেই হবে, নইলে আপনাকে দেখাব না।' তিনি প্রায় ঈশ্বরের মতোই বললেন, 'তথাস্তু'। (এখানে 'ফি'-এর কথাটা একটু খোলসা করা যাক। আমার কেমন বদ্ধমূল ধারণা 'ফি' না পেলে ওঁদের (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) মুখটা কেমন ব্যাজার হয়ে ওঠে; তখন কি আর ভালো করে রোগী দেখা যায়! আর হবে নাই-বা কেন? ডাক্তারিটা তাঁর পেশা, 'ফি' তাঁর ন্যায্য পাওনা, পারিশ্রমিক। আমি নিজেই তো হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে ওই সামান্য ক-টা টাকা পাই বলে সারাদিন কেমন মুষড়ে থাকি। আর সেজন্যই উপরোধে ঢেঁকি গিলে কাউকে 'ফি' না-নিয়ে দেখতে হলে ওঁদের মুখ ভার। মুখে না বললেও আচারআচরণে বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন তা। সঙ্গে জুড়ুন, পাড়াতুতো ঠাক্‌মা-দিদিমাদের মুখের বুলি: ডাক্তারকে ফি না দিলে অসুখ সারে না। ফলে 'ফি-নেওয়া' ডাক্তারবাবুদের কাছে বিনা পয়সায় দেখানোতে আমার ঘোর আপত্তি)।

অল্প দিনের মধ্যে বয়সে-ছোটো ডাক্তারটির সঙ্গে দোস্তি জমে গেল। নরম কথাবার্তা; রোগ নিয়ে অনেক কথা বলে যান তাঁদের বিশুদ্ধ 'মেডিক্যাল ভাষায়'। সেগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে ঘরের ছাদে উড়তে থাকে। বলি, 'আপনার কথার বিন্দুবিসর্গও তো আমার মাথায় ঢুকছে না।' একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, আপনাকে একটা বই দিই, কাজে লাগবে আপনার।' বলে হ্যারিসন-এর *প্রিন্সিপলস অব ইনটারনাল মেডিসিন* (দু-ভল্যুমে) আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তিনি বোধ করি আমাকে এক বিরাট বোদ্ধা ঠাউরেছিলেন।

তাঁর চিকিৎসার ধরনটা যেমন পেয়েছি, লিখছি। ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক জানবেন 'ডাক্তারবাবুরা' (হ্যাঁ, মহিলা-ডাক্তারকেও আমরা ওই সম্বোধনই করি, তারপর জিব কাটি।) একমাস-দু-মাস অন্তর তিনি দেখতেন। প্রতিবার ইসিজি, ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি পরীক্ষা হত, সঙ্গে লিপিড প্রোফাইল। ওঁর একটা পোর্টেবল ইকো-মেশিন ছিল; কখনো সেটায়, কখনো-বা দক্ষিণ কলকাতার কোনো-না-কোনো অভিজাত ক্লিনিক কাম ল্যাবরেটরিতে। সেসব

---

* পিপোফিশো: দু-জন শুয়ে আছে। আগুন লেগেছে, একজনের পিঠ পুড়ছে; সে বলতে চাইছে 'পিঠ পোড়ে'। আর একজন তাকে পরামর্শ দিচ্ছে 'ফিরে শোও'। কিন্তু দু-জনেই এত কুঁড়ে যে পুরো কথাটা বলার মেহনতটুকুও তারা করতে রাজি নয়। তাই ছোটো করে বলা—তাতে যা হবার তা হোক।

'স্বাস্থ্যমন্দিরের' এমন সুদর্শন চেহারা, দেখলেই 'শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ভয়ে' মাথা নত হয়ে আসে নিজে থেকেই; আর হাতদুটো পকেট হাতড়েই চলে—আছে তো, নাক কাটা যাবে না তো!

আমার ডেরায় তাঁর প্রায়শই যাতায়াত, সঙ্গিনী মনঃসমীক্ষক। ওঁর চেম্বারেই হৃদ্‌রোগীদের কাউন্সেলিং করেন। অমন ফরসা আর আপেলের মতো লাল গাল আমি আর দু-টি দেখিনি। একদিন ভ্যাবলার মতো বলেই ফেললাম, 'কী লাল আপনার গাল দু-টো।' তিনি হেসেই কুটোপাটি। আমায় বেকুব বানিয়ে বললেন, 'ওটা রুজ, তাই অত লাল।' এক রোববার, বেরোইনি। বিকালে স-সঙ্গিনী ডাক্তার হাজির। 'বুঝলেন, আপনার একবার ইকো-টা করা দরকার, নিন শুয়ে পড়ুন।' শুয়ে পড়লাম।

ইসিজি ১০০ টাকা, ইকো ৯০০ টাকা; মাঝেমাঝেই ইকো-কালার ডপ্‌লার টেস্ট হত, সেটা ১২০০ টাকা। এ ছাড়া তিন-চারবার টিএমটি (ট্রেডমিল টেস্ট)ও হয়েছিল। সেটাও ওই ১২০০-১৪০০ টাকা করে হবে। অত মনে নেই, সব কাগজপত্রও নেই, যা আছে তা কে এখন ঘাঁটতে যাবে। লিপিড প্রোফাইল—কোথাও ৯০০, আবার কোথাও ১৪০০ টাকা।

একবার কলকাতার এক অভিজাত বেসরকারি হাসপাতালে আমায় ইকো-কালার ডপলার টেস্টের জন্য নিয়ে গেলেন। ডাক্তার নিজেই ওই সংস্থায় যুক্ত। কিন্তু তিনি নিজে করবেন না; করবেন আর একজন নামকরা ইকো-কার্ডিয়োলজিস্ট। অপেক্ষায় বসে আছি—চেম্বারের বাইরের ঘরে একটা সোফায়। আমার পাশে আর একজন। মুখেচোখে অসুস্থতার ছাপ। ভাবলাম, হবে হয়তো আমারই মতো কেউ। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। ভাবখানা, দেখে ফেলবে না তো কেউ! তাঁর এই সন্ত্রস্ত চাউনির মানে বোঝা গেল একটু পরেই। পকেট থেকে বেরোল সে-আমলে চালু পানপরাগের ঢাউশ একটা প্যাকেট। পুরোটা ঢেলে তালুবন্দি করে একবারেই গপ করে মুখে পুরে দিলেন। চারটে রাজভোগ একবারে মুখে পুরলে যেমন হয়, তিনি তেমনি 'গালফোলা গোবিন্দ' হয়ে কচরমচর করে চিবোতে লাগলেন। আমি যারপরনাই চটে গিয়ে বললাম, 'আপনার লজ্জা করে না, হার্টের অসুখ, টেস্ট করাতে এসেছেন আর এইসব অখাদ্য-কুখাদ্য নেশাভাঙ করছেন?' তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে নির্বিকার চিত্তে পানপরাগ চিবোতে থাকলেন।

আমার ডাক পড়ল। সহকারী আমাকে বাঁ-কাত হয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় শুয়ে পড়তে নির্দেশ করলেন। বাধ্য রোগী আমি। ডাক্তারবাবু এলেন, আমার বুকে জেল-মাখানো যন্ত্রটা বসিয়ে নাড়াচাড়া করছেন; টুকটাক দু-একটা প্রশ্ন। আমি শোওয়ার ধরনের জন্য তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কিছুক্ষণ বাদে সহকারী হাতে টিস্যু কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, মুছে নিন।' উঠে, ডাক্তারকে দেখে আক্ষরিক অর্থেই আমার মুখটা ইংরেজি 'O'-র আকার নিল, বাক্‌রুদ্ধ আমি। তিনি মিটিমিটি হাসছেন তখন।

নিয়মিত টেস্টের সঙ্গে তরুণ ডাক্তারবাবুটি মন দিয়ে ওষুধ লিখে চলেন। ইকোস্পিরিন। বলেন, 'আপনার একটু বিটা-ব্লকার দরকার', খসখস করে লিখে দেন 'বিটালক' না কী যেন একটা। কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড যাতে না বাড়ে তার জন্য ওষুধ। তখন নামগুলো মুখস্থ ছিল, এখন আর মনে নেই। প্রেসক্রিপশন ঘাঁটলে পাওয়া যেতে পারে। তবে তখন আমার রক্তচাপ স্বাভাবিক, তাই প্রেশারের ওষুধ খেতে হত না। তিনি যতটা মন দিয়ে প্রেসক্রিপশন করতেন, আমিও ততটাই মন দিয়ে কোনোটা খেতাম, কোনোটা খেতাম না। কখনো খেতাম, কখনো খেতাম না। নিয়মিত ওষুধ খেতাম—এ দাবি একদা আমার 'অন্ধভক্ত বড়ো মেয়েও' করতে পারবে না।

একবার চেম্বারে গিয়েছি। তার আগে যে-বার গিয়েছি, তখন থেকে একটাও ওষুধ খাইনি। কাজের এত চাপ! ইসিজি করে ডাক্তার খুব উৎফুল্ল। 'বাঃ! খুব ভালো। বোঝা যাচ্ছে,ওষুধবিষুধ ঠিকঠাক খাচ্ছেন।' জবাব দিলাম, 'না, একেবারেই না।' অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছু বললেন না।

কেন বললেন না? পরে ভেবেছি। প্রথম প্রথম যখন যেতাম, ওঁর প্রাইভেট চেম্বারে, রোগী বলতে আমি প্রায়শই একা। বুঝতাম, 'প্র্যাকটিস' তেমন জমেনি। এদিকে একে আমি হার্টের রোগী, তায় 'হ্যারিসন' পড়ি। 'বাইপাস' বলি না, বলি 'সিএবিজি', 'অ্যাঞ্জিয়োপ্ল্যাস্টি'কে বলি 'পিটিসিএ'। 'হ্যারিসন' কী পড়ি আর না পড়ি, কী বুঝি, না বুঝি তা তো আর আমার চেনাজানারা জানেন না। তাঁরা এসে হামলে পড়েন, যেন-বা আমিই এক কার্ডিয়োলজিস্ট! এ লেখা পড়তে পড়তে আপনারা আমায় যতই নিন্দেমন্দ করুন, ওইটুকু হুঁশ আমার আছে। নিজেকে নিয়ে যতই ফস্টিনস্টি করি না কেন, অন্যের রোগ নিয়ে, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো অধিকার আমার নেই। তাই, যাঁরাই আসেন, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিই আমার ডাক্তারের কাছে। তাঁর পসার একটু হলেও জমে ওঠে। সেকারণেই হয়তো-বা আমাকে একটু মান্যিগণ্যি। ভেতর ভেতর রাগ হলেও গুমরোতে থাকেন, মুখে কিছু বলেন না।

এই পর্বে আরও দু-একটা জমাটি রহস্য ঘটে গেছে, যা না বললেই নয়। আমার অর্শ বহু পুরোনো। বিচক্ষণ অধ্যাপক জামাইবাবুর পরামর্শে কিছুদিন হোমিয়োপ্যাথি; পরবর্তীকালে আর এক ভূয়োদর্শী অধ্যাপক-বন্ধুর জোরজবরদস্তিতে কবিরাজি; কখনো-বা ডাক্তারের পরামর্শে মলম আর গরমজলে সেঁক—তাও যখন বাড়াবাড়ি হয় তখনি। কিন্তু অপারেশন নৈব নৈব চ। কেননা, আমিও তো বহুদর্শী কম ছিলাম না, তবে এখন যাকে বলে—আবোদা। 'অপারেশনে অর্শ কিচ্ছু সারে না—ওই দিন কতক, ফের হয়।'—এই আপ্তবাক্যে আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এখন তা কিছুটা শিথিল হলেও, একেবারেই যে গেছে তাই-বা বলি কী করে। সে যাহোক, আমার অর্শ আছে, এই তথ্যটি আমি সব হৃদ্‌রোগের ডাক্তারকে দিয়েছি; এঁকেও দিয়েছি। তিনি কিছু বলেননি বা কোনো ব্যবস্থাও নেননি। এদিকে আমি স্ফূর্তিতে ইকোস্পিরিন খেয়ে যাচ্ছি; কারণ ডাক্তারদের কথাবার্তা শুনে বুঝে গিয়েছি যে ওইটাই রক্তকে পাতলা রাখে (blood-thiner)।

একদিন বিছানায় শুয়ে, আমার যা পেশা, কাটাকুটি খেলছি। হঠাৎই আমার কোমরের দিকটা কেমন ভিজে ভিজে লাগছে মনে হল। উঠে দেখি রক্তে-রক্তে আমার লুঙি ভিজে সপ্‌সপে। সেটা ছেড়ে আর-একটা পড়লাম-তারও একই দশা। মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া থামেই না। গেলাম চেনাজানা এক নার্সিং হোমে। তাঁরা মলদ্বার সাময়িক সিল করে দিলেন। দু-বোতল রক্তও নিতে হল। ইকোস্পিরিন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিলেন এবং অবশ্যই অর্শটা অপারেশন করিয়ে নিতে বললেন। খবর পেয়েই আমার কার্ডিয়োলোজিস্ট ওই নার্সিং হোমে ছুটে এসেছেন। অনুযোগের সুরে বললেন, 'আপনার অর্শ যে এত গুরুতর—আমাকে

বলেননি তো; তাহলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেত। যাহোক, আমি না বলা পর্যন্ত ইকোস্পিরিন আর খাবেন না।' এ-কথার কী জবাব দেব আমি, চুপ করে রইলাম।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদে এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদে পাহাড়-প্রমাণ বই জমা দেওয়ার দক্ষযজ্ঞ সমাধা হওয়ার পর একেবারে যেন নেতিয়ে পড়লাম। ২০০৫-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি (পয়লা বৈশাখ) প্রকাশন সংস্থায় ব্যাবসায়িক উৎসব। আমি লেখক, ছাপাখানা-কাগজ-বাঁধাই-মালিক ও কর্মীদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎই শুরু হল বুকে যন্ত্রণা। এটা ততদিনে আমার অভ্যাসের মধ্যে। একটা সরবিট্রেট নিলাম, কমে না। ডাক্তার এলেন। নিজেই নামি এক বেসরকারি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করে দিলেন। তাঁরা আমাকে ফের একটা সরবিট্রেট দিয়েছিলেন মনে আছে। আর কী কী হয়েছিল স্পষ্ট মনে পড়ছে না। তবে ওষুধবিষুধ আগে যা চলছিল, ভর্তির পরও তাই। নতুনের মধ্যে আঙুলে একটা ক্লিপ মতো আটকিয়ে একটা মনিটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে নানা গ্রাফ, সংখ্যা ফুটে উঠছিল। ওটা কী যন্ত্র আমি জানি না, জিজ্ঞেসও করিনি। দিন পাঁচেক ছিলাম। তার মধ্যে দু-বার লিপিড, দু-বার ইকো করা হল। চলে এলাম। কেন ভর্তি হয়েছিলাম, কেন ছেড়ে দিল—কিছুই বুঝলাম না। না ডাক্তার, না হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ আমায় খোলসা করে বলেছেন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। মিনিট তিনেকের বেশি হাঁটতে পারি না। সিঁড়ি ভাঙতে দম বেরিয়ে আসে। যখন-তখন বুকে চিন-চিন, শ্বাসনালীটাকে কে যেন মুচড়ে ধরছে। ডাক্তার বললেন, 'না, আর ওষুধ দিয়ে ঠেকানো যাবে না। অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফিটা আপনাকে করতেই হবে।' আর এক নামি বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের নাম সুপারিশ করে দিলেন। 'আমার সব বলা আছে, কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।' সেই যে তিনি চলে গেলেন, আর মুখোমুখি হননি।

বুঝতে পারছি, পাঠকের ভুরু কুঁচকে গেছে। এতসব নামিদামি জায়গায় পরীক্ষানিরীক্ষা, ফি-দিয়ে ঘন ঘন ডাক্তার দেখানো—পয়সাটা জুটছে কী করে! না, আমি কোনো 'জোগায় চিন্তামণির' দোহাই পাড়ছি না। হয়েছে কী, এই সময়টাতে আমার 'বেঁচে থাকাটা' আমার কাছে যতটা, তার থেকেও অনেক বেশি জরুরি প্রকাশকের কাছে। আমার ও আর কয়েকজনের কাঁধে চেপে তিনি কোটি টাকার ব্যবসা ফাঁদতে চলেছেন; আমি পড়ে গেলে তিনি তো হুড়মুড়িয়ে পড়বেন। সেজন্যে আমার অসুখের খরচখরচা চালাতে তিনি দু-পায়ে খাড়া; এটা তাঁর ব্যবসায়ে একটা লগ্নি।

ডাক্তারবন্ধুটি আমায় ২০০২ সালের শেষদিক থেকে ২০০৪ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত চিকিৎসা করেছিলেন। পরীক্ষানিরীক্ষার খরচের কথা আগেই লিখেছি। ডাক্তারের ফি কখনো ২০০ টাকা, কখনো ২৫০ টাকা, কখনো-বা ৩০০ টাকা। মাসে ওষুধ খরচ গড়ে ২০০০ থেকে ২৫০০ টাকা। আগে জানলে পুরো হিসাবটা রেখে দেওয়া যেত—এই পর্বে মোট খরচ কত হয়েছিল, বলে দেওয়া যেত।

ডাক্তার-রোগীর টানাপোড়েনের এই চক্করে ঠিক-ভুলের দায়ভার কার কাঁধে চাপানো যায়, তা ঠিক করা দুষ্কর। ডাক্তার বলবেন, রোগী আমার কথা শোনে না; ডায়াবেটিসের রোগী যদি মিষ্টি দেখলে হামলে পড়ে; ঠিকমতো ওষুধবিষুধ খায় না; সময়মতো টেস্টগুলো করায় না—অসুখটা সারবে কী করে? আর রোগী বলবেন, গাদাগুচ্ছের টেস্ট করেই যদি রোগ ধরতে হয়, তবে ডাক্তার হয়েছেন কী করতে? সত্যিই কী অত টেস্ট অত ঘন ঘন করতে হয়? মিষ্টি খাব না কেন, আলবত খাব—আরে ডায়াবেটিসের ওষুধ তো খাচ্ছি!

এসব নানা কিসিমের চাপান-উতোর থেকে আসল সত্যটা টেনে বার করতে পারেন—সমাজবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানীবৃন্দ। তবে এই চিকিৎসা পর্ব থেকে একটা কথা তো আমার মোটা মাথাতেও ঢুকে গেছে—গাঁটের কড়ি খরচা করে এই এলাহি চিকিৎসা-খরচ চালাতে আমার মতো মাঝারি মাপের মানুষের রোগ সারা তো দূরের কথা, দু-দিনেই ফতুর হয়ে দুনিয়া-ছাড়ার টিকিট কাটতে হবে। তাহলে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষগুলো?

তৃতীয় পর্ব

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে, ভাই।
. . .
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা—
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই॥

অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করতে যাব কি যাব না, গড়িমসি করছি; কিন্তু সবার চাপে যেতেই হল। বিশেষত প্রকাশকের চোখমুখের যা অবস্থা; যেন সামনে সমূহ ভরাডুবি দেখছেন। আমার খুব খারাপ লাগাল। যেন আমাকে নয় ওঁকে বাঁচাতেই আমার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফিটা করে নিতে হবে। ২০০৫ সালের ৫ অক্টোবর নামি বেসরকারি হাসপাতালটায় ভর্তি হওয়ার খুঁটিনাটিতে যাচ্ছি না। এটুকু বললেই যথেষ্ট—সেখানেও হ্যাঁপা কম নয়। সরকারি হাসপাতালে একরকম, এখানে আরেক। অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করার সময়ে ডাক্তারকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি রেডিয়োগ্রাফিক নন-আয়োনিক কনট্রাস্ট এজেন্ট ব্যবহার করছেন তো?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলে সেরে দিতে চাইলেও তিনি যে বেশ চমকে উঠেছিলেন, তা স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে মনে হেসেছিলাম। কুঁচকিতে কী একটা ঢুকিয়ে দিয়ে মনিটরে দেখছেন আর বলছেন—এবার আপনার এখানটা গরম লাগবে, সইতে না পারলে বলবেন। হয়ে গেলে পাশের ঘরে বেশ খানিকটা সময় রইলাম। তারপর বেডে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, 'চিন্তা নেই, বাড়ির লোককে ডেকে সব বলে দিয়েছি।'

ডান পা-টা যেন পাথর, একটা আঙুলও নাড়াতে পারছি না। আমার পাশের বেডের রোগীকে দেখলাম, নিয়ে গেল কোনো-একটা পরীক্ষা করাতে। বারোটা নাগাদ খাবার এল, মাছ-ভাত-ডাল তরকারি। বিস্বাদ, এঁরা কি বাঙালি রান্না জানেন না? পাশের বেডের ভদ্রলোক এলেন দু-টো নাগাদ। খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নার্সকে ডেকে বললেন, বাংলা তো দূরস্থান, এঁরা না বোঝেন ইংরেজি, না বোঝেন হিন্দি। হাসেন আর অনবরত দু-দিকে মাথা নেড়ে চলেন। গলদঘর্ম হয়ে যখন ভদ্রলোক কোনোমতে বোঝাতে পারলেন, জানা গেল 'লান্চ' তো হয়ে গেছে—এখন আর খাবার দেওয়া যাবে না।

বুঝুন অবস্থা! আমরা ক-জনে মিলে বেডে বসেই তুমুল হই-হল্লা জুড়ে দিলাম। ধমক দিতে দিতে ছুটে এলেন মেট্রন আর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ।

আমরা পালটা ধমক লাগালাম—আপনারাই রোগীকে পরীক্ষা করাতে নিয়ে গিয়ে 'লান্চ আওয়ার' পার করে দিয়েছেন আর এখন বলছেন খাবার দেওয়া যাবে না; লোকটা না খেয়ে থাকবে না কি? কাজ হল, অবশেষে ভদ্রলোক খেতে পেলেন।

সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ সুসজ্জিতা এক তরুণী হাতের ক্লিপবোর্ডে কিছু কাগজ আর ঠোঁটে পেন কামড়ে ধরে বেড়ে বেড়ে ঘুরে ঘুরে কীসব বলছেন। আমার বেডের পাশে দাঁড়ালেন। অভিজাত এক-চিলতে হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললেন, 'কী কেমন লাগছে? আমাদের মতো সেরা সার্ভিস কি এখানে আর কোথাও পাবেন? খাবারের কোয়ালিটি, রান্নাবান্না কেমন, চমৎকার না?' ('যা বাবা! আমি কি ভুল করে কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলে ঢুকে পড়লাম নাকি!) জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের রাঁধুনি কি বাঙালি?'

—না, কিন্তু কেন বলুন তো?

—পদগুলো বাঙালির, কিন্তু রান্নাটা কোথাকার কে জানে! তিনি থমথমে মুখে বললেন, 'এরকম করে আপনি বলতে পারেন না, আজ পর্যন্ত আমাদের সার্ভিস নিয়ে কেউ কোনো কথা তুলতে পারেনি।

—আমি তুললাম। যদি চান লিখে নিন আমার অভিযোগ।

বলে পাশের বেডের ইতিবৃত্ত মহিলাকে জানালাম। তিনি আমার কথা কানে প্রায় না তুলেই হনহনিয়ে হাঁটা দিলেন।

রাতের খাবার আটটার মধ্যেই সারা। একজন দেখি আমার বেডের দিকেই আসছেন। লম্বায়-আড়ে অমন বিশালকায় চেহারা সচরাচর আমার চোখে পড়েনি। এসেই আমাকে বলতে শুরু করে দিলেন, 'আপনার যেটা হয়েছে . . . ধরুন একটা জলের ট্যাঙ্ক . . .' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে টালা ট্যাঙ্ক অব্দি যেতে হবে না; আমার হৃৎপিণ্ডে রক্তসরবরাহকারী ধমনিগুলোর কী হাল বলুন।' একটু থমকে গলাটা ভারী করে জবাব দিলেন, 'আপনার ট্রিপল ভেসল করোনারি আর্টারি ডিজিজ। সিএবিজি করতে হবে। ব্যবস্থা সব পাকা, কাল বাদ পরশু আপনার অপারেশন।' বললাম, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

—কোনো দরকার নেই; ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

আমার মাথায় তখন একরাশ ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। বেডে শুয়ে-শুয়েই জানতে পারছি—এদের সিএবিজি-র সাত দিনের প্যাকেজ এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা। যাঁদের অপারেশন হয়ে গেছে, তাঁদের কারও বিল এক লাখ আশি, কারও-বা দু-লাখ, কারও তারও বেশি ছাড়িয়ে গেছে। আছেন হয়তো দু থেকে চারদিন। দিন যত বাড়বে, টাকার অঙ্কও তো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। মিনমিন করে জানালাম, 'পরশু তো সপ্তমী, পুজোর মধ্যে এত বড়ো একটা অপারেশন; কোনো ইমার্জেন্সিতে কিছুই তো পাওয়া যাবে না। পুজোর পরেই করুন না।' তিনি মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়িয়ে বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না, পরশুই তাহলে অপারেশন, কেমন?' মুখে তাঁর এক বরাভয়-মার্কা হাসি। পড়লাম মহা আতান্তরে। মরিয়া হয়ে বললাম, 'টাকাটা তো অপারেশনের আগেই জমা দিতে হবে?' বললেন, 'অবশ্যই'। —'আমি বাইরে না বেরোলে টাকার জোগাড় কী করে হবে?'

—'ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু ঠিক দশমীর পর অপারেশন, আর-একটা দিনও দেরি নয়। আপনার যা অবস্থা, যখন-তখন একটা কিছু হয়ে যাওয়া . . .।'

যেন বাঘের মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। তবে আর এক ঝামেলা। কিছুতেই অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফির রিপোর্ট, সিডি দিতে চায় না। আমার ভাই অনেক হুজ্জত করে ওগুলো বার করে আনে। কিন্তু সত্যি সত্যি এত টাকা পাই কোথায়? এতদিন ছিল হাজারে-হাজারে; প্রকাশক তা জুগিয়ে গেছেন। এবারে তো লাখ ছাড়িয়ে। ছোটো ভাই, বেশ কয়েকজন বন্ধু পাশে দাঁড়ালেন—একজন তো পুরোটাই চেক লিখে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে লাগলেন। আমি অভিভূত, কিন্তু দেনা তো, শোধ করব কী করে? মন স্থির করতে পারছি না। একবার ভাবছি, যা হবার তা হবে—কাঁটাছেড়ার মধ্যে যাব না। পরক্ষণেই ছেলেমেয়েগুলোর মুখ ভেসে আসছে। এখনও তো বড়ো হয়নি; আমি রোজগার না করলে ওরা বাঁচে কী করে? মুশকিল আসান করলেন সেই প্রকাশক। মনে হয় তাঁর তখনও আমাকে প্রয়োজন ছিল। দু-একজন সহকর্মী নিয়ে বাড়িতে এসে তিনি জানালেন, রয়্যালটি বাবদ তাঁর কাছে আমি নাকি অনেক টাকা পাই, সবটা তিনি এখনই দিতে পারছেন না, তবে এ-টাকাটা দিতে চান কেননা ওটা আমার প্রাপ্য। ভাবলাম, মন্দ কী, নিজের রোজগারের টাকায় যখন পারব তখন অপারেশনটা করিয়েই নিই। তবে 'জলের ট্যাঙ্ক' ডাক্তারবাবুর কাছে নয়।

আমার এক শ্রদ্ধেয় অগ্রজ বন্ধুর যোগাযোগে আর এক নামি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁরা যত্ন নিয়ে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফির রিপোর্ট, সিডি দেখলেন, আমাকেও বোঝালেন, আমি যদিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। বললেন, 'সিএবিজি-ই ভালো, তিনটে অ্যাঞ্জিয়োপ্ল্যাস্টিতে খরচ অনেক বেশি। এখানে প্যাকেজ এক লাখ কুড়ি হাজার। আর এক হাসপাতালেও হয় পঁয়ষট্টি হাজারে কিন্তু ওখানকার সিসিইউ-টা এত খারাপ, যখন তখন ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। আমি বলব, তাই এখানেই করুন।' পরে অবশ্য ওই হাসপাতালের অনুজ এক ডাক্তারবন্ধু আমায় বলেছেন, 'রক্ষণাবেক্ষণ এত খারাপ যে সরকারি/বেসরকারি কোনো হাসপাতালেরই ''বিশেষ ইউনিটগুলো'' (আই সি ইউ, আই সি সি ইউ, আই টি ইউ ইত্যাদি) কখনোই জীবাণুমুক্ত থাকে না।

যাঁর যোগাযোগে এখানে আসা তাঁর এক আত্মীয় এখানে কার্ডিয়োলজির বিভাগীয় প্রধান। তার ওপর আমার এক পুরোনো অনুজ বন্ধুও এখানে। সবমিলিয়ে দেখভাল ভালোই। তবে খুব সর্দি লেগে গেল। বললাম, 'এর মধ্যে অপারেশন করবেন?' ওঁরা বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই'। সিএবিজি হয়ে গেল ২৫ অক্টোবর, ২০০৫। সার্জন বললেন, 'আপনার দু-টো গ্রাফটিং করে দিলাম, আর একটার দরকার পড়ল না, ওটায় কোল্যাটেরাল থেকে যথেষ্ট সাপ্লাই আসছে।' হতেও পারে —ট্রিপল ভেস্‌ল ডিজিজে দু-টো গ্রাফটিং। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছুই তো জানা নেই। আমি দু-টো রিপোর্টই এখানে তুলে দিচ্ছি। কেউ যদি আমার ধন্দের নিরসন করে দেন।

আমার প্রথম অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি

Coronary Angiogram Report

LMCA : Distal left main having 30%-40% lesion.
LAD : Type-II good caliber vessel, long segment, 60% lesion in the proximal and mid LAD.
LCX : Non-dominant, totally occluded in proximal segment.

RCA : Dominant good caliber vessel, 100% long segment occlusion in the mid segment. Distal vessel filling via collaterals.
Renal Arteries : Bilateral normal renal arteries.
Final Impression : Triple vessel coronary artery disease.
Recommendation : CABG

আমার CABG-র discharge summary

Diagnosis : Severe double vessel coronary artery disease with normal LV function.
Treatment : OPCABX2 LIMA to LAD
SVG to PLV br. of RCA
- using octopus stabilizer

These 55 yrs. old gentleman was admitted with effort angina for Bypass Surgery. Coronary angiography showed 80% of LAD and 99% PLV br. of RCA. His LVEF was 50% and LVED was 8mm of Hg.

. . .

আমার ধন্দ 'Triple vessel disese'টা মাত্র কুড়ি দিনের ব্যবধানে 'Double vessel disease' হয়ে গেল কী করে? সার্জন বলেছিলেন, 'আর একটায় গ্রাফটিং করার দরকার হয়নি, কেননা ওটাতে কোল্যাটেরাল থেকে সাপ্লাই আসছে। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী RCA-র distal vessel-via collateral filled হচ্ছে। সেটার PLV Br.-এ তো গ্রাফটিং করেছেন। আর non dominant totally occluded in proximal segment LCX-এ তো কিছুই করেননি।

অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোনো টানের রোগটা ফিরে এল। যেটা ২০০০ সালে হার্ট অ্যাটাকের পর ভোজবাজির মতো উবে গিয়েছিল। ঘুমোতে পারছি না। হাঁপরের মতো টেনেই চলেছি। এক রাতে খুব বাড়াবাড়ি। সব সময়ে দেখাশোনার নার্সটি ওই রাতেই দু-তিনজন ডাক্তারকে হাজির করালেন। অপারেশনে যিনি অ্যানাসথেটিস্ট ছিলেন, তিনি আমাকে দেখতে-দেখতে একটা অস্ফুট উচ্চারণ করলেন—(একে আমি তখন খাবি খাচ্ছি, মাথাটার কেমন একটা এলোমেলোভাব, ফাঁকা-ফাঁকা; তাই ধান শুনতে কান শুনেছি কিনা!) যেন শুনলাম, 'ঘেঁটেঘুটে কী করেছে কে জানে!'

হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স-অন্যান্য কর্মীরা সবাই বেশ ভালো। মুখে সদা মাপা হাসি। তবে যেন কেমন কাঠপুতুলের মতো। দরজা-জানালা, টেবিল-চেয়ার, বেড এবং রোগী সবকিছুর প্রতিই একইরকম নিরাসক্ত আচরণ। রোগীও যে এই জড়সামগ্রীর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, সেটাই যা-কিছু আশ্চর্যের। 'মুন্নাভাইয়ের' ডা. খুরানার কথা মনে পড়ে যায়, যিনি পেশেন্টকে' 'সাবজেক্ট' ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। আর একটা মনে হত, 'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।' এর মধ্যেই দু-জন নার্সকে আমি আজও ভুলতে পারিনি; যাঁদের সম্পর্কে বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া 'সেবার মাতৃমুর্তি' ছাড়া অন্য কোনো কিছু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ কেউ হয়তো যেকোনো পরিবেশে তাঁর স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেন—এঁরাও তেমনই কেউ।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। কয়েকদিন বাদেই চেক আপ। সার্জন সময় দিয়েছেন সকাল সাড়ে এগারোটা। ভাবলাম-কতক্ষণই-বা লাগবে, ফিরে এসেই খাওয়া-দাওয়া করব। বসে আছি। 'একটা বাজে, দেড়টা-দু-টো বাজে, নেইকো তাড়া, হয় বা পাছে দেরি।' ডাক্তার এলেন চারটেয়। যেন আমার এই সাড়ে-চার ঘণ্টার শবরীর প্রতীক্ষা, অতি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। বললাম, 'না-খেয়ে এতক্ষণ বসে আছি; আপনার দেরি হবে জানতে পারলে খেয়েই আসতাম।' তিনি নির্বিকার মুখে জানালেন, 'সেটা আপনার সমস্যা, আমাকে দেখাতে হলে এরকমই হবে।' বুকে নয়, মাথায় একটা ধাক্কা লাগল, সবিনয়ে জানালাম, 'ডাক্তারবাবু আমার সময়ের বিনিময়ে যে সময়টাকে আপনি অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করতে নিয়োজিত ছিলেন; সহৃদয় হয়ে যদি চারটেয় আসতে বলতেন, তবে এই সুযোগে আমার পেশায় আমিও কিঞ্চিৎ কামিয়ে নিতে পারতাম।' তাঁর উত্তর, 'তবে অন্য কাউকে দেখান।' তাই করেছি। যিনি ওই সার্জনকে সুপারিশ করেছিলেন, তারপর থেকে তাঁকেই দেখিয়েছি।

ইনি ডাক্তার ভালো। আমার তো তাই মনে হয়। কাজের লোক, বাজে বকেন না। মানুষও ভালো। আমাকে প্রথমেই বললেন, পাইলসটা 'টেনসন ব্যান্ডিং' করিয়ে নিন। গা করিনি। ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই চিকিৎসা। সুবিধা-অসুবিধা হলেই ফোন। ফোন ধরেননি, কখনো এমন হয়নি। ব্যস্ত থাকলে হয়তো 'আধ ঘণ্টা পরে করুন' বলতেন। ছ-মাস অন্তর লিপিড প্রোফাইল, বছরে একবার ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি। এক মাস দু-মাস অন্তর অন্তর ঘন ঘন নয়। বললেন, আপনার তো সিওপিডি আছে। সেরো ফ্লো, অ্যাসথালিন ইনহেলার দিলেন। হার্টের ওষুধ তো আছেই। বছরে দু-বার, কখনো-বা তিনবার সর্দিকাশির বাড়াবাড়ি, সঙ্গে টান। শুতে পারি না, ঘুমোতে পারি না। রাতের পর রাত জেগে কেবল টেনেই চলেছি। ডাক্তার আমাকে কখনো অ্যালেগ্রা, কখনো অ্যাজিথ্র্যাল, কখনো অন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ও সঙ্গে ওয়াইসোলোন স্টেরয়েড (ট্যাপারিং করে) দিলেন। প্রথম প্রথম কাজ দিচ্ছিল, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, এতে তেমন কিছু হচ্ছিল না। একটা কথা বলা দরকার, ডাক্তারবাবুটি ভালো হলে কী হবে, রোগী তো এদিকে 'স্বৈরাচারী'। ফলে ক্রমেই যে শারীরিক ও মানসিকভাবে রুগ্ন হয়ে পড়ছিলাম, তার দায় কার ঘাড়েই-বা চাপাই!

২০১২-র গোড়া থেকে হাল আরও খারাপ হতে শুরু করল। সেই তিন মিনিটের বেশি হাঁটতে না পারা, বুকে ঘন ঘন চিড়িক ব্যথা; মাঝেমাঝেই হাতে ছড়াচ্ছে। বাইপাস হবার পর থেকেই খুব একটা ঘোরাফেরা করি না। সপ্তাহে একদিন পেশার প্রয়োজনে বেরোতেই হত। এখন তাও যেন শরীর করতে রাজি নয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ ফের সর্দিকাশি, টানের হামলা, ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। আগের ব্যবস্থাপত্র মতো ওষুধ খেলাম। কোনো লাভ হল না। আমি ঠিকমতো ওষুধ খাই না বলে বোধ হয় ডাক্তার আমার উপর একটু ক্ষুব্ধ। ওঁকে তাই ফোন করতে সাহসে কুলোয়নি। আমি একজনকে খুবই মানি, তাঁরও সিওপিডি। ওঁর দ্বারস্থ হলাম ফোনে। তিনি কোনোরকম পরামর্শ দিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বললেন, কোন ওষুধ তিনি খান। তাই কিনে খেলাম। সেবারের মতো ফাঁড়া কাটল।

বলতে ভুলে গেছি ২০০৬-এর শেষাশেষি প্রকাশকের বোধ করি আমাকে

নিয়ে কাজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই 'পাজি' হয়ে গেলাম। ডাক্তার-ওষুধবিষুধ -পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ চালানো আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠছিল। সেটা আমার ডাক্তারকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না, কেননা তাহলেই তো তিনি পয়সা না নিয়ে চিকিৎসার তোড়জোড় শুরু করে দেবেন।

কিন্তু ক্রমেই কেমন জবুথবু হয়ে যেতে লাগলাম। হাঁটতে পারি না। রাতে শুলেই বুকের উপসর্গগুলো শুরু হয়ে যায়। রাতে প্রায় নিয়মিত সরবিট্রেট নিই। গোটা শরীর জুড়ে ক্লান্তি। কোনো কাজে মন বসে না; কাজ করতে ইচ্ছে করে না। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে আমার প্রেশার বেড়েছে। তার ওষুধও খেতে হয়। যেতেই হল ডাক্তারের কাছে। তিনি দেখেশুনে ওষুধবিষুধ কিছু বদলে দিলেন, বললেন, 'আর একটা অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করতে হবে।' করলাম।

এবারের রিপোর্ট:

LMCA : Distal 30-40% narrowing.
LAD : Type III vessel. Proximal LAD has eccentric 50% lesion.
D1 has aneurysm & eccentric 40% stenosis.
D2 bifurcation has 60% stenosis, Upper branch of D2 has 90% stenosis. Distal LAD is filling through grafts injection and during LCA injection also.
LCX : It has 30% diffuse disease proximally and 100% occluded in mid segment.*
RCA : It is 100% occluded in mid segment.
LIMA : Normal
Renal Angiography: Both renal is having mild disease, left is more than the right.
DIAGNOSIS : Coronary Artery Disease : Triple Vessel Disease.
Patent LIMA. Other grafts not visible
Aortic bifurcation disease.
Recommendation: Revascularisation

রিপোর্ট পেয়ে আমার ডাক্তার ওই হাসপাতালেই আমার যে অনুজ ডাক্তার বন্ধুটি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দু-জনেই বললেন, 'এখন ''কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টেই'' থাকুন। কিন্তু আপনাকে পাইলসটা অপারেশন করতেই হবে।' পাইলস অপারেশন করাতে আমি তখনও গররাজি ছিলাম। তবু ওঁর সুপারিশে এক ডাক্তারকে দেখালাম। তিনি যা ফিরিস্তি দিলেন এবং টাকার যে অঙ্কটা বললেন তাতে দমে গেলাম। কেননা পঁচাত্তর হাজার টাকা আমার তখনও ছিল না, এখনও নেই আর প্রকাশক 'স্বজনটি' তো কবেই হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

* আগের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফিতে LCX totally occluded in proximal segment; এবারে LCX-এ 30% diffuse disease proximally and 100% occluded in the mid segment এটাও একটা ধন্দ্ব আমার কাছে। এবং কেন এটায় Grafting করা হল না,তাও বুঝিনি।

কী আর করি। ওষুধবিষুধগুলোই একটু নিয়মিত খাওয়া শুরু করলাম। কিন্তু শরীর যে তিমিরে সেই তিমিরেই। মনে হত, আর যে-কটা দিন থাকব, এরকম নিষ্কর্মার ঢেঁকি হয়ে শুয়েবসে আর হা-হুতাশ করেই দিন কাটাতে হবে হয়তো।

এভাবেই না-চলার মতো করে চলতে থাকলাম বছর দেড়েক। অসুখবিসুখ নিয়ে এতসব ঘটতে থাকলেও কোনোদিনই অসুখকে আমার মাথার ওপর চেপে বসতে দিইনি—শরীর থাকলে অসুখ হয় আর আমি থাকি আমার মনে। এ-হেন মানুষটিও কিন্তু সর্দিকাশি আর শ্বাসকষ্টর ঠেলায় জেরবার; রীতিমতো আতঙ্কের ভূত চেপে বসল আমার কাঁধে। রাতে শ্বাস টানতে টানতে মনে হত, এবারের শ্বাসটাই বোধহয় শেষ। ফের যদি হয়—আর পারব না। ২০১৪-র শেষাশেষি ফের বেদম হয়ে পড়লাম। কিছুতেই কিছু হয় না। রাতগুলো বিভীষিকা। কী করি!

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সঙ্গে যোগাযোগ বেশ কিছুদিন ধরে। অনেককেই সেখানে দেখাতে নিয়ে গিয়েছি। এমন আন্তরিকতা নিয়ে গরিব মানুষজনকে চিকিৎসা করার ধরন দেখে কম অবাক হইনি। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে জাঁকজমকহীন অনাড়ম্বর পরিবেশে এমন উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। নিজের রোগ নিয়ে কোনোদিন দেখাইনি কুণ্ঠায়। এখানে যাঁরা দেখাতে আসেন তাঁদের থেকে তো আমার অবস্থা ভালো। কিন্তু গরজ বড়ো বালাই।

যখন কোনোদিকে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি না, একদিন ডা. গুণকে ফোন করলাম, 'আপনাকে দেখাতে চাই।' বললেন, 'আসুন'। দেখাতে গিয়েছি। চেম্বারে ঢুকতেই থানার বড়োবাবুর গলায় হাঁক, 'পকেট-ফকেট সার্চ কর তো!' এ কীরে বাবা! চোর-ছ্যাঁচোর নাকি আমি। বয়সে বড়ো বলে একটুও মান্যিগণ্যি নেই! এ কার পাল্লায় পড়লাম। তবে ডাক্তার, আপনার যদি ডালে ডালে, আমার ঘোরাফেরা পাতায় পাতায়। সার্চ করে লাভ হবে কি কিছু? যাহোক, ভালো করে দেখলেন। পুরোনো কাগজপত্রও সব দেখলেন। আমার তখন এমন অবস্থা, নেবুলাইজার ব্যবহার করতে হল। তাঁর মতো করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। ইনহেলারের বদলে রোটোহেলার দিলেন। বললেন, 'ইনহেলারে ওষুধটা আপনার ভিতরে ঠিকমতো ঢুকতে পায় না।' অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স দিলেন। দিন সাতেকের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে এল।

তখন থেকে ওঁকেই দেখাই। যে আমি সপ্তাহে একদিন বেরোতে হিমশিম খেয়ে যেতাম, এখন প্রায় রোজই কাজের প্রয়োজনে বেরোচ্ছি। অনেকটা পথ হেঁটেচলে বেড়াতে পারছি। কাজ করার এনার্জি বেড়ে গেছে। ওষুধ খরচ কমে চার ভাগের এক ভাগ। পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ যৎসামান্য। তাতেই তো শরীর অর্ধেক চাঙা। মনে পড়ে, যেখানে আমার প্রথম অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি হয়, সেই হাসপাতালের এক সিএবিজি রোগীর ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার প্যাকেজ লাফিয়ে দু-লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। কী করে এই টাকা মেটাবেন সেই চিন্তায় চিন্তায় তাঁর আর বাড়ি ফেরা হয়নি; মর্গ ফেরত সোজা ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অনেকটা সীমিত হলেও যেন-বা ২০০০ সালের আগের মতোই চনমনে হয়ে উঠেছি। তবে পাইলসটা এখনও অপারেশন করানো হয়নি। ওঁকে বললাম, সপ্তাহে একদিন যদি ওঁদের সঙ্গে কাজ করার

সুযোগ পাওয়া যায়। রাজি হলেন। বুধবার করে আসি। এখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ডাক্তারদের কাছেই প্রশিক্ষণ নিয়ে কী চমৎকার ভাবে ক্লিনিক চালান, তা যত দেখি, তত ভাবি—এমনটা কেন সর্বত্র হয় না!

কুড়ি বছর ধরে চলছে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ। প্রচারের ঢক্কানিনাদ নেই। লোকমুখে শুনে শুনে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন, মানবিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার আশায়। শুধু ক্লিনিক চালানো নয়; মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলার জন্য পত্রিকা প্রকাশ, স্বাস্থ্য আন্দোলনকে আরও বেশি বেশি জনমুখী করে তোলার নানা প্রয়াস এঁরা নিরন্তর নিয়ে চলেছেন। কাজ করলে সমস্যা থাকবেই। আমার যতদূর নজরে পড়েছে—ডাক্তারদের ক্রম অপ্রতুলতা, অন্যান্য নানা কাজে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব ইত্যাদি নানা কারণে হাতে গোনা কয়েকজনের ঘাড়ে বিপুল কাজের ভার চেপে বসেছে। ডা. গুণের সঙ্গেই গাড়িতে ফিরি। কখনো দেখি তিনি ফোনে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরক্ষণেই জেগে হাসিমশকরা শুরু করে দিলেন। গলার স্বরে কি ক্লান্তির আভাস কোনো! মনটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভিতর চিনচিন। বাড়ি ফিরে একটা সরবিট্রেট জিবের তলায় আলগোছে ফেলে দিই। স্বস্তি। □

লেখকের পেশা: গ্রন্থ সম্পাদনা; প্রাবন্ধিক অনুবাদক, অভিধানকার।

টুকরো খবর

স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার বিড়ম্বনা

ডায়গনিস্টিক টেস্টের জন্য প্রাইভেট হাসপাতালগুলো রোগীদের থেকে যে দাম নেয়; সেটা সত্যিই ন্যায্য দাম তো। বড়ো বড়ো কয়েকটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ ও পরীক্ষানিরীক্ষার নিয়মিত খরচ-খরচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে দাম প্রাইভেট হাসপাতালগলো নেয় তা অস্বাভাবিক রকমের চড়া। সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে তুলনায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় প্রাইভেট হাসপাতালে এইসব টেস্টের দাম অনেকটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়।

১. সিটি স্ক্যান (১৬ স্লাইস)

সরকারি হাসপাতালে দাম **১৫০০** টাকা
মেশিনের মূল্য ২ কোটি টাকা
টেকনিশিয়ান-এর ফি: মোট দামের ২ শতাংশ
রেডিয়োলজিস্ট-এর ফি: মোট দামের ১৫ শতাংশ
ফিল্ম: মোট দামের ০.৩ শতাংশ
দিনে ১০টা সিটি স্ক্যান হলে মাসে ২ লাখ টাকা লাভ হয়।
প্রাইভেট হাসপাতালগুলো গড়ে **৩৫০০** টাকা করে নেয়।

২. এম আর আই

সরকারি হাসপাতালে দাম **২২৫০** টাকা
মেশিনের মূল্য ৫ কোটি টাকা
টেকনিশিয়ান ফি: দামের ২ শতাংশ
রেডিয়োলজিস্ট-এর ফি: দামের ১৫ শতাংশ
ফিল্ম: দামের ০.৩ শতাংশ
দিনে ২০টা এমআরআই হলে মাসে ৩ লাখ টাকা লাভ হয়।
প্রাইভেট হাসপাতালে গড়ে **৭০০০** টাকা করে নেওয়া হয়।

৩. আলট্রাসোনোগ্রাফি

সরকারি হাসপাতালে দাম ২২৫ টাকা, New Line মেশিনের মূল্য ৩০ লাখ টাকা
রেডিয়োলজিস্ট-এর ফি: দামের ২৫ শতাংশ
অন্যান্য খরচ: দামের ৫ শতাংশ
দিনে দশটা করলে মাসে ৩ লাখ টাকা লাভ।
প্রাইভেট হাসপাতালে গড়ে **১৫০০-২০০০** টাকা নেওয়া হয়।

৪. পেট সিটি স্ক্যান

এন আর এস হাসপাতালে দাম **১৫০০০** টাকা
প্রত্যেক টেস্ট-এর খরচ **১২০০০** টাকা (যার মধ্যে এফডিজি ইঞ্জেকশনের দাম ৬০০০ টাকাও ধরা আছে)। প্রাইভেট হাসপাতালে গড়ে **২৫০০০** টাকা নেওয়া হয়।

বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে এত বেশি খরচ কেন?

- ঝাঁ-চকচকে, হাসপাতাল বাড়ি-চত্বর
- দামি দামি উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি
- ডাক্তারের কমিশন
- টেকনিশিয়ান-এর চড়া দাম
- ঋণ পরিশোধ
- তুলনায় রোগীর সংখ্যা কম।

সূত্র: *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ৮ জুন, ২০১৫।

হৃদ্‌রোগ

করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম কি করতেই হবে?

চিকিৎসা সংক্রান্ত খবরাখবর যারা একটু রাখেন তাঁদের কাছে করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম পরীক্ষাটি খুব পরিচিত। বহুল প্রচারে ধারণাটি এরকম—বুকে ব্যথা 'হার্ট ব্লকের' কারণে হচ্ছে কিনা তা বোঝার অব্যর্থ পরীক্ষা হচ্ছে করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম। আর বাঁচতে গেলে তারপর তো হয় অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে 'স্টেন্ট' বসানো না হলে বাইপাস। কিন্তু বিষয়টা অন্য রকম কিছু নয় তো!

বুকের ব্যথা ও হার্ট ব্লক

দিনের বেলা বা রাতের বেলা কাজ করতে করতে বা বসে থাকতে থাকতে বুকে ব্যথা উঠলে মানুষ খুব ঘাবড়ে যায়। সব ব্যথা হার্টের ব্যথা বলে ধরে নেয়। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে শতকরা ৮০ শতাংশ হচ্ছে ফুসফুস, বুকের পেশির ব্যথা বা মানসিক উদ্বেগজনিত ব্যথা। বাকি ২০ শতাংশ হৃদ্‌রোগজনিত ব্যথা যার মূল কারণ 'হৃদ্‌ধমনির ব্লক'।

এখানে 'হৃদ্‌ধমনির ব্লক' বলতে বোঝানো হয় হৃৎপেশির ধমনিতে কোলেস্টেরল যা আনুষঙ্গিক পদার্থ জমে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা। এই ধমনি সরু হয়ে যাওয়া যদি ৭০-৮০ শতাংশের নীচে থাকে তাহলে তার জন্য সাধারণত বুকে ব্যথা হয় না। আর যদি 'ব্লক' অর্থাৎ ধমনি সরু হয়ে যাওয়া ৭০-৮০ শতাংশের বেশি হয় তাহলে পরিশ্রম করলে হার্টের উপর চাপ পড়ে বুকে ব্যথা হয়—সেই কষ্ট থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে কিছু ওষুধের ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী অনুশীলন করাই যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোলেস্টেরল ও আনুষঙ্গিক পদার্থ জমে ধমনিগাত্রে তৈরি হওয়া প্লাকের অবস্থা। অনেক সময় এই 'প্লাক' বিচ্যুত হয়ে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে ধমনিতে রক্ত চলাচলে সম্পূর্ণ বাধা দেয়। যার ফলে হৃদ্‌পেশির মৃত্যু ঘটে। একে হার্ট অ্যাটাক বলে। এর ফলে রোগীর অবস্থার অবনতি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু কোন 'প্লাক' বিচ্যুত হতে পারে তা আগে থেকে নির্ণয় করার মতো কোনো পরীক্ষা এখনও বেরোয়নি।

যাই হোক হার্ট অ্যাটাক বুঝতে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা E.C.G. বা ট্রপোনিন-টি বা আরও সস্তা 'ক্রিয়াটিনিন ফসফোকাইনেজ' করা যেতে পারে। এই সব পরীক্ষা দিয়ে হার্ট অ্যাটাক নিশ্চিত হয়েছে বুঝতে পেরে এবং রোগী যদি ২ ঘণ্টার মধ্যে এসে থাকে তখন করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসানো হলে রোগীর পক্ষে লাভজনক। বুকে ব্যথা নিয়ে এমার্জেন্সিতে আসা রোগীর ১.৫ শতাংশের কমবেশি ২ ঘণ্টার পরে এলে আর 'স্টেন্ট' বসিয়ে আলাদা কোনো সুবিধা হয় না, সেক্ষেত্রে

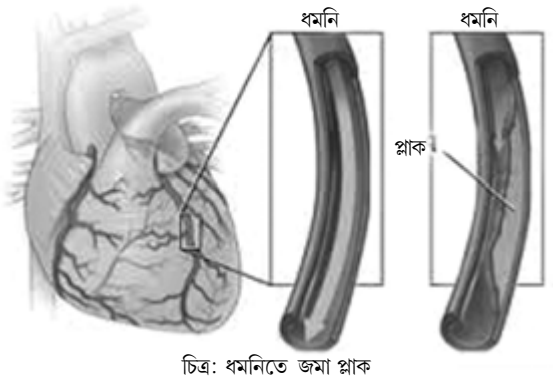

চিত্র: ধমনিতে জমা প্লাক

জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেওয়ার চিকিৎসা 'থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি' করা উচিত।

করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করার কী অর্থ

তাহলে দেখা যাচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এরকম ১.৫ শতাংশ রোগী তাও দু-ঘণ্টার মধ্যে এসেছে যারা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করা সম্ভবত; তাদের ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম দরকার হয়। আর দরকার হয় কী ধরনের বাইপাস অপারেশন করা হবে তা বোঝার জন্যে। তা না হলে শতকরা কতভাগ ব্লক আছে সেটা বার করার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে আমাদের দেশে শতকরা ৫৫ ভাগ অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম ও বাইপাস বিনা প্রয়োজনে হয়। এখানেই লুকিয়ে আছে করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করার অর্থ কর্পোরেট হাসপাতালের 'অর্থের' জোগান দেওয়া এবং তার এক কণা প্রসাদ পাওয়ার জন্যে ডাক্তাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা করান। এই অনর্থকর পরিষেবা থেকে বোধহয় আশু মুক্তি নেই।

চর্মরোগ মানে লিভার খারাপ?

''যেকোনো চর্মরোগই লিভার থেকে হয় আর ডিম খেলে সব চর্মরোগ বাড়ে''—এটা বঙ্গদেশে একটা সার্বজনীন লোকবিশ্বাস, কারও ডিমে অ্যালার্জি থাকলে সাধারণত তা খাওয়ার আধ-একঘণ্টার মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পাবেন! তাহলে ডিম একেবারে বন্ধ। অন্যথা আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষদের জন্য ডিমের মতো সস্তায় অতি পুষ্টিকর খাদ্য কমই আছে। লিভারের কাজকর্ম করার ক্ষমতা একদম খারাপ হয়ে গেলে চামড়ায় কিছু সমস্যা দেখা যায়, যেমন চুলকানোর লক্ষণ, লালতিলের মতো জিনিস। কিন্তু অধিকাংশ চর্মরোগের ক্ষেত্রে লিভারের বিন্দুমাত্র ভূমিকাই নেই।

কত ভূমি কাঁপলে তবে মানুষ বদলাবে?

নেপালের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর সেখানে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন এখানকার কিছু চিকিৎসক, ছাত্র ও সমাজকর্মী। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছেন **ডা. জিৎ সরকার**।

২৫ এপ্রিল যখন প্রথম ভূমিকম্প দেখা দেয় তখনও ভাবিনি যে তার দু-সপ্তাহ বাদেই আমরা নেপালের উদ্দেশ্যে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে রওনা দেব। প্রথম কম্পন যখন হয় তখন আমি রাস্তাতেই ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে ভেবেছিলাম যে সকাল থেকে কিছু না খাওয়ার ফলে হয়তো আমার 'সিনকোপ' হচ্ছে। তবে ঠিক পরমুহূর্তেই পথচারী আর দোকানদারদের সমবেত হইচই থেকে বুঝতে পারি যে ওটা সিনকোপ নয়, ভূমিকম্প। এর আগে শেষবার যখন কম্পনের সাক্ষী হয়েছিলাম তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় হবে। গ্রামের বাড়িতে বালতির জলের কাঁপুনি দেখিয়ে দিদি আর জেঠিমা প্রথম ভূমিকম্প চিনতে শিখিয়েছিলেন। তবে এবার ভূমিকম্প চিনতে সময় যত না লেগেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি সময় বাকিদের প্রতিক্রিয়া দেখতেই লেগে গেছে। নেপাল যাওয়ার পথে আরও দু-বার বেশ জোরালো কম্পনের সম্মুখীন হয়েছিলাম। তখনও মানুষের আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া নজর কেড়েছিল আমার। বুঝেছিলাম কেন্দ্রে বসে প্রান্তের আনন্দ, কষ্ট আর অনুভূতির বিন্দুমাত্র আন্দাজ পাওয়া যায় না। তা বুঝতে গেলে পৌঁছে যেতে হয় প্রান্তে। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নেপালযাত্রার এক অন্যতম উপলব্ধি এটাই।

১১ মে বিকেলে আমরা হাওড়া থেকে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী নিয়ে রওনা হই মিথিলা এক্সপ্রেসে করে। অবশ্য সেই মুহূর্তের অনেক আগেই আমাদের নেপালের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বন্ধুরা সাহায্য জোগাড় করতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে। ট্রেন-বাস আর খোলা প্ল্যাটফর্মের পথচলতি মানুষের থেকে; বাজারের দোকানদারদের থেকে আর চেনা-অচেনা বহু মানুষের থেকে সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রীকে সম্বল করেই আমরা যাত্রা শুরু করি। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল কম্বল, ত্রিপল, শুকনো খাবার, বাচ্চাদের নানান খেলনা আর নানাবিধ ওষুধ। আমাদের যাত্রাপথ ছিল বিহারের মধ্যে দিয়ে। মিথিলা এক্সপ্রেস করে আমরা পরের দিন ১২ মে সকালে পৌঁছে যাই বিহার তথা ভারতের শেষ প্রান্ত রক্সৌলে। রক্সৌলে নেমেই সর্বপ্রথম আমার নজর কেড়ে নেয় স্টেশনের বাইরের এক মন্দির। একথা বহুবার শুনেছি যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, যেখানে পুরোনো ভাবনার ধারাবাহিকতা আজও উপস্থিত, সেখানে বিচিত্র সব বিশ্বাস আর ধারণার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এই মন্দিরেও সেইরকম এক মেলবন্ধন দেখলাম। মন্দিরের দেবতা ছিল পশুপতি শিব আর গোপালের এক মিশ্র মূর্তি।

রক্সৌলে আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম ওপার সীমান্ত থেকে আসা আমাদের নেপালি বন্ধুদের জন্য। ওদের নির্দেশ মতোই আমাদের সমস্ত সামগ্রীসহ সীমান্ত পার হয়ে কাঠমাণ্ডুর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করার কথা। রক্সৌল স্টেশনে বসে না থেকে আমরা রক্সৌল অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। আশপাশের এলাকাগুলো বেশ জনবহুল। বাড়িগুলো বড্ড কাছাকাছি, ঘিঞ্জি। রাস্তাঘাটের মধ্যে অনেক অলিগলি আছে, নর্দমা ব্যবস্থা খুব খারাপ আর পরিচ্ছন্নতার বেশ অভাব। এরই মাঝে বেশ কয়েকটা বিউটি পার্লার। বাজার এলাকাটাও জমাটি। হরেকরকমের আচার বিক্রির রেওয়াজ ওখানে খুব চালু। তা ছাড়া নানারকম স্ট্রিট ফুডের চলও বেশ ভালোই। তবে এরকম জনবহুল এলাকাতে দেওয়াল লিখন বা পোস্টার (রাজনৈতিক, ধার্মিক বা সাংস্কৃতিক তিন প্রকারেরই) সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আমাদের অন্তত বেশ চোখে লাগল। যাহোক, কিছুটা ঘোরার পর আমরা আবার রক্সৌল স্টেশনে ফেরত চলে এলাম।

যখন প্রায় বিকেল হতে চলেছে তখন আমরা আবার সাক্ষী হলাম দ্বিতীয় বৃহৎ কম্পনের। যে ভূমিকম্পে আক্রান্ত মানুষদের উদ্দেশ্য আমরা ত্রাণ নিয়ে চলেছি সেই ভূমিকম্প আরও একবার নিজেকে প্রকট করল। তবে এবার আমরাও টের পেলাম সাধারণ মানুষের আতঙ্কের অনুভূতির। কলকাতায় বসে সেদিন যেভাবে অনুভব করেছিলাম কম্পনকে, রক্সৌলে তা বেশ অন্য রকমই লাগল। কম্পনটা যেন অনেক সরাসরি মনে হল, অনেক কাছের মনে হল আর সেই কারণেই হয়তো অনেক ভয়াবহ মনে হল। কম্পন শেষ হতেই আমরা নেপালি বন্ধুদের তত্ত্বাবধানে টাঙ্গায় করে ভারত-নেপাল সীমান্তের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমস্ত সামগ্রী নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বীরগঞ্জ ঢুকতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লাগে।

বীরগঞ্জে পৌঁছে বাসে সমস্ত সামগ্রী তুলে আমাদের দ্বিতীয় দফার লম্বা সফর শুরু করলাম কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যাবেলায় বাস ছাড়ল। শুনলাম গোটা রাত্রি লেগে যাবে কাঠমাণ্ডু পৌঁছোতে। রাত্রির অন্ধকারে আশপাশের অবস্থা বিশেষ দেখতে পাওয়া যায়নি। পাহাড়ি সেই পথের পাশে খুব বেশি ঘনবসতিও অবশ্য ছিল না। শুধু মাঝে একবার যখন নৈশাহারের জন্য বাস থেমেছিল তখন মানুষের আতঙ্কের একটু আন্দাজ পেয়েছিলাম। যেখানে আমরা থেমেছিলাম, সেটা একটা শহর এলাকা, তবে সেই শহরের বাড়িগুলোর বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি দেখলাম না। যেগুলো বেশ পুরোনো আদলে তৈরি সেগুলোই কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; আধুনিকভাবে বিম আর টাইবিম দিয়ে নির্মিত বাড়িগুলো অটুট আছে। ভূমিকম্পের আতঙ্কে বেশ কিছু লোকেদের বাইরে পার্কে কিংবা কোনো ফাঁকা জায়গাতে তাঁবু খাটিয়েই রাত্রিযাপন করতে দেখা গেল। মাঝরাতে আমাদের বাস একবার নারায়ণী নদীর ধারে থামে। নদীর স্রোতের আওয়াজ উপর থেকে শোনা যাচ্ছিল। সেখানে আমরা এক ঝলকের জন্য আবার একটা কম্পনের সম্মুখীন হই। মুহূর্তের মধ্যেই ঘরে থাকা লোকেরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। যে বাচ্চারা বাইরে ঘুমোচ্ছিল তারাও ভয়ে জেগে যায়। সারাক্ষণ মানুষ এই যে আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটাচ্ছে তার আরও প্রমাণ অবশ্য আমরা পরে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে গিয়ে পেয়েছিলাম।

রাত্রের যাত্রা শেষ হল পরের দিন সকালে কাঠমাণ্ডু পৌঁছে। হাওড়া

থেকে রওনা দেওয়া আমাদের ১৪জনের টিমের সঙ্গে কাঠমাণ্ডুতে আরও ৪ জন যোগদান করেন। এঁরা উত্তরবঙ্গ হয়ে অন্য পথে সেখানে পৌঁছেছিলেন। সেখানে আমরা সমস্ত ত্রাণসামগ্রী নিয়ে উঠলাম 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল-মাওবাদী'-র পার্টি অফিসে। ভূমিকম্প আক্রান্ত এলাকা সম্বন্ধে জানবার অসীম উৎসাহকে যে আমরা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম তা এখানেই প্রথম ছাড়া পেল। শুধু এটুকুই নয়, নেপালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা এখান থেকেই ওয়াকিবহাল হতে শুরু করি। এই অফিসেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয় চূড়ামণির। চূড়ামণির বয়স ৩৫ বছর, তবে ওর দৈহিক কাঠামো দেখে ওকে ২৬-২৮ বছরের মনে হয়। চূড়ামণির কাছে শোনা কথা, আর তারপর নেপাল দেখার অভিজ্ঞতায় দেশটা সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি সেটা এখানে দু-চার কথায় বলে নেব। সেটা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে হয়তো, কিন্তু যে ভূমিতে ভূমিকম্প হল, সে ভূমির কথা না জানলে ভূমিকম্প জানা একপেশে হয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

চূড়ামণি ১৯৯৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী নিজের আত্মীয়দের মুখেই ও প্রথম কমিউনিজমের ভাবনা শোনে আর তাতে অনুপ্রাণিত হয়। ম্যানেজমেন্টের কোর্স শেষ করেই তখন চূড়ামণি কাঠমাণ্ডু ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে পাড়ি দেয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত নেপালে জোতদার-জমিদার আর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক জনযুদ্ধ চলে। সেই জনযুদ্ধের শেষ পর্বে, অর্থাৎ ২০০২ থেকে ২০০৬, চূড়ামণি গণমুক্তি বাহিনীর হয়ে জনযুদ্ধে যোগদান করে। সর্বসাকুল্যে ১৭০০০ মানুষ মারা যায় সেই জনযুদ্ধে। সেই যুদ্ধের পরিণতিতেই রাজতন্ত্র নেপাল থেকে কিছুটা হটে যদিও তার ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু পরিমাণে বর্তমান। সাধারণ মানুষের মনোভাব, আচার-আচরণ থেকে রাষ্ট্রচালকদের মধ্যেও রাজতান্ত্রিক ধরন-ধারণ এখনও কিছুটা টিকে আছে। সেই জনযুদ্ধেই চূড়ামণির সঙ্গে দেখা হয় জুমির। তাদের প্রথম দেখা আর আলাপ হয়েছিল গণমুক্তি বাহিনীর এক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ শিবিরে। জনযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চূড়ামণি জুমিকে বিয়ে করে।

নেপালের ব্যাপক দুরবস্থার কথা প্রথম চূড়ামণির মুখেই বিস্তারিত আকারে জানতে পারি। দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হল 'রেমিটেন্স'। জনসংখ্যার এক বড়ো অংশ বিদেশ থেকে পাঠানো এই রেমিটেন্সের অর্থের সাহায্যেই জীবনযাপন করে। দেশের কৃষিব্যবস্থার হাল একেবারেই ভালো নয়। কৃষিপণ্য বাজারে বিক্রয় করা তো দূরের কথা, নিজেদের ভরণপোষণের জন্যও সেই উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। কৃষি উৎপাদন করেও ওদের প্রায় অর্ধেকের বেশি কৃষিপণ্য বাজার থেকে কিনতে হয় নিজেদের আহারের জন্য। দেশে শিল্পবিস্তারের কোনো বালাই নেই। বৃহৎ ও ভারী শিল্প তো দূরের কথা সামান্য যে সকল অসংগঠিত ক্ষুদ্র শিল্প দেশে চালু ছিল তাও প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ এক স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। সরকারি স্কুলের দুরবস্থার দরুন শহরের স্বচ্ছল মানুষরা বেসরকারি স্কুলকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে গ্রামাঞ্চলে সরকারি স্কুলই একমাত্র উপায়, তা সে যতই খারাপ হোক না কেন। স্বাস্থ্যের বিষয়টাও শিক্ষার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। সরকারি হাসপাতালে গরিবের যাতায়াত আর বেসরকারি নার্সিং হোমে বড়োলোকের। কথায় কথায় এও শুনলাম যে দেশের প্রায় ৮০ লক্ষ যুবক নাকি কাজের খোঁজে দেশান্তরি হয়েছে, যেখানে নেপালের জনসংখ্যাই হল মোটামুটি ৩ কোটি। এদেশে মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় ভারতীয় ছাপ বেশ প্রবল। বলিউডি হিন্দি সিনেমা আর গানের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাও বেশ জনপ্রিয় নেপালে। রাস্তাঘাটের দোকানগুলোতে যেসব ফাস্ট ফুড দেখা গেল, তার অধিকাংশই ভারত, চীন আর বাংলাদেশ থেকে আমদানি হওয়া। কাঠমাণ্ডু শহরটাতে বাড়ির সংখ্যা মাত্রাধিক। এক একটা বাড়ির দেওয়াল একে অপরের সঙ্গে লাগানো। সরকারি আইন অনুসারে নাকি তিনতলার চেয়ে উঁচু বাড়ি বানানো মানা। তবে আইন মানানোর ব্যবস্থার অভাবের দরুন বহুসংখ্যক বাড়ি তিনতলার চেয়ে উঁচু। কাঠমাণ্ডু শহরে ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাড়ির সংখ্যা নেহাতই কম। শহরের বুকে কিছু পুরোনো স্মৃতিসৌধ অবশ্য ভেঙেছে। কিছু বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। তবে ঘরবাড়ি না ভাঙলেও আতঙ্কের ঠেলায় জনগণ বাড়ির বাইরে কোনো পার্কে অথবা রাস্তার মোড়ে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিযাপন করছে। সরকারি ঘোষণার দিকে সকলেই তাকিয়ে আছে। সরকারের বিশেষজ্ঞ দল যখন বিপদের সম্ভাবনার ইতি টানবে তখনই সবাই আবার ঘরে ফিরতে শুরু করবে। শহরের জীবন যে পুরো থমকে গেছে তা নয়। দোকান, বাজার,নার্সিং হোম, যানবাহন সবই একরকম চালু আছে। স্কুল-কলেজে অবশ্য ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাঠমাণ্ডু শহরে আমরা একদিন কাটিয়ে পরের দিন চলে গেলাম শহর থেকে প্রায় ঘণ্টা চারেক দূরে এক পাহাড়ি গ্রামে। প্রথমে সমতল বরাবর আমরা ঘণ্টা তিন যাত্রা করে পৌঁছোই কাব্রে জেলায়। সেখানে বনেপা আর ধুলিখেল এই দুই জায়গায় আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াই। তারপর আরও পাহাড়ি রাস্তা বরাবর আমরা ইন্দ্রাবতী আর সুনকশি নদীর পাশ দিয়ে উঠতে শুরু করি। খাড়া পাহাড় বরাবর প্রায় দু-ঘণ্টা বাসে করে উঠতে উঠতে আমরা পৌঁছোই এক পাহাড়ি গ্রাম সাপিংয়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬,০০০ ফুট

উপরে অবস্থিত সে গ্রাম। রাস্তা দেখেই অনুমান করা যায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষের অবস্থা। সাপিং যাওয়ার পথে আমরা ধুলিখেল নামে যে শহরে থেমেছিলাম সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় নেপালের একটা যুব-বাহিনী। ৪০ জনের এই বাহিনীও সাপিং গ্রামে ত্রাণের লক্ষ্যে যাচ্ছে। ওরা সঙ্গে এনেছে কিছু চাল, ডাল, সোয়াবিন, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আর ওষুধ। টানা ১০ দিন ওরা সেই গ্রামেই দিন কাটাবে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবে আর ভাঙা বাড়ি মেরামত করতে ওদের সাহায্য করবে। খাড়া পাহাড়ি রাস্তা বরাবর উঠতে উঠতে আমরা অবশেষে পৌঁছোলাম এই সাপিং গ্রামে। এই গ্রামেই আমরা পরের দু-দিন নিজেদের ত্রাণকার্য চালাই।

একটা স্কুলবাড়িকে কেন্দ্র করেই সে কাজ চলে। দু-দিন ধরে চলে 'মেডিক্যাল ক্যাম্প'। আর পাশাপাশি চলে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি পরিক্রমা করতে করতে সামগ্রী বিতরণ। ভাঙা বাড়ি সারানোতেও আমরা বাকিদের কিছুটা সাহায্য করি। এই গ্রামেই আমাদের পরিচয় হয় ওই স্কুলের এক শিক্ষক টঙ্কারাম অধিকারীর সঙ্গে। মেডিক্যাল ক্যাম্পে টঙ্কারাম ছিলেন আমার অনুবাদক। ফলত তাঁর মাধ্যমেই আমি ওখানকার মানুষের জীবনের আন্দাজ পাই। বিকেলবেলায় ক্যাম্পের কাজ সেরে আমরা গ্রাম পরিক্রমা করতে তাঁর সঙ্গে বেরোতাম, আর নানা কথা হত। সেইসব কথার মধ্যে দিয়ে আরও কিছুটা ধারণা হয়। ক্যাম্প চলাকালীন তাঁকে 'স্কেবিস', 'রক্তাল্পতা' ইত্যাদি নানা রোগও চিনিয়েছি। টঙ্কারাম তাতে বেশ খুশিই হয়েছেন।

টঙ্কারামের বয়স ৬৩ বছর। তবে বয়সের তুলনায় তাঁর জানবার ইচ্ছা লাগামছাড়া, আর শারীরিক সক্ষমতা তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। টঙ্কারাম 'অখিল নেপাল শিক্ষক সমিতি'-র সদস্য। শিক্ষক হওয়ার দরুন তাঁর পরিচিতি সুদূর প্রসারিত। ১৮ বছর ধরে তিনি বন-সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কোন কোন গাছ কাটবে, কে কাটবে আর তা দিয়ে কী করা হবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করা, আর তার পাশাপাশি কাঠচুরি আটকানো ও বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা সামলানোই ছিল টঙ্কারামের কাজ। এই টঙ্কারামের থেকেই আমি নেপালি সমাজের বিভিন্ন আচার-বিশ্বাসের ও নেপালি মানুষের মানসিকতার গল্প শুনি। কাজের বাইরে আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে অনেক কথা হয়। নেপালি সমাজে মেয়েদের অবস্থান, গ্রাম আর শহরের পার্থক্য, ধর্মবিশ্বাসের প্রকোপ ইত্যাদি বিষয়ে উনি উৎসাহ নিয়েই আলাপ চালান। দীর্ঘ এই আলাপের কারণেই হয়তো বিদায়বেলায় দু-জনকেই একটা চাপা দুঃখ নিয়ে ফিরতে হয়।

ভূমিকম্পের কারণে টঙ্কারামের গ্রামের বাড়িটা ভেঙে গেছে। গ্রামের অন্যান্য বাড়িগুলোর বেশিরভাগই ভাঙা। সাপিং গ্রামে মোট ১৬ জন বাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। দু-টো পরিবারে আবার দু-জন করে নিহত। স্কুল বাড়ির দু-টো বড়ো বড়ো ঘর যেভাবে ভেঙেছে তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ভূমিকম্পের তীব্রতাকে। সেদিন শনিবার স্কুল ছুটি ছিল বলে ছাত্রছাত্রীরা বড়ো কোনো দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। ছুটি না থাকলে যে কী হত তা ভাবলেই সারা দেহে শিহরন জাগে। তা ছাড়া ভূমিকম্পটা সকালে হয়েছিল বলেও রক্ষে। রাত্রে হলে আহত আর নিহতদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বহুগুণ বেড়ে যেত। আমরা যে জেলাটায় গিয়েছিলাম তার নাম কাব্রে। কাব্রের পরের যে জেলাটা তার নাম সিন্ধুপালচক। সিন্ধু-পালচকে নিহতদের সংখ্যা সর্বোচ্চ—৩৫০০।

'শ্রী সেতীদেবী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'কে কেন্দ্র করে আমাদের ত্রাণকার্য চলে। দু-দিনে মেডিক্যাল ক্যাম্পে মোট ২৭৫ জন দেখাতে আসেন। এর মধ্যে ৩৯ জনের বয়স ১০ বছরের কম, ১২১ জনের বয়স ১০-৪০ এর মধ্যে আরও ১১৫ জন ৪০ বছরের বেশি। যেসব রোগ আমরা ওখানে লক্ষ করেছি তার বিবরণ এরকম—

১. শারীরিক চোটের কারণে হাড় ভেঙে গেছে অনেকের, তবে আমরা যখন পৌঁছোই ততদিনে ভাঙা হাড় ভুলভাবে জুড়ে গেছে। চোখে দেখে যদিও বা তা বোঝা যাচ্ছে, রোগীর তরফে কিন্তু কোনো ব্যথার বহিঃপ্রকাশ নেই।

২. বয়স্কদের মধ্যে এক বড়ো অংশ ঘাড় আর কোমরের ব্যথার সমস্যা নিয়ে এসেছিল। বয়স্কদের মধ্যে হাঁটুর ব্যথার, যা হয়তো 'অস্টিও-আর্থাইটিস', প্রাদুর্ভাব ভালোই ছিল।

৩. 'স্কেবিস', বা ছোঁয়াচে চুলকানি—এর বেশ কিছু রোগীর দেখা মেলে ওখানে। বাড়ির একজনের স্কেবিস থাকলে অন্য সদস্যরাও সেই একই রোগে আক্রান্ত হন।

৪. মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের সমস্যা আর সাদা স্রাবের সমস্যা লক্ষণীয়।

তা ছাড়া ক্যাম্পে আসা একটা বড়ো অংশের মূল সমস্যা ছিল বদহজম, গায়ে ব্যথা, চোখে ব্যথা আর জ্বালা জ্বালা ভাব ইত্যাদি। তবে এই সমস্যাগুলো কতটা শারীরিক আর কতটা 'স্ট্রেস-রিলেটেড' অর্থাৎ ভূমিকম্পের আতঙ্কের পরিণতি, তা বুঝে ওঠা যায়নি। এর একটা বড়ো কারণ হল ভাষাজনিত দূরত্ব। শারীরিক সমস্যাগুলো যদিও বা অনুবাদকের সাহায্যে কিছুটা বুঝতে পারছিলাম, মানসিক কারণগুলো অনুসন্ধান করতে গেলে যে সেই ভাষাতেই প্রত্যক্ষভাবে রোগীর সঙ্গে আলাপ চালাতে হবে তা উপলব্ধি করলাম। এর পাশাপাশি আরেকটা বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করলাম যেটার সঙ্গে হয়তো আমরা

পরিচিত নই। মেডিক্যাল ক্যাম্পে যখন মা তার সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আসছে তখন সমস্যা বলার সময় সে নিজের আর সন্তানের সমস্যা সব এক সঙ্গেই বলে দিচ্ছে। অর্থাৎ একে একে বলার বা ডাক্তারের প্রশ্ন অনুযায়ী বলার যে শৃঙ্খল আমরা শিখে থাকি তার কিছুটা অভাব ওখানে আছে। হয়তো এই কারণেই আমার ওষুধ লিখতে লিখতে অনেকবারই সন্দেহ হয়েছে নিজেকে নিয়ে, নিজের জ্ঞানকে নিয়ে আর রোগীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে। সত্যি বলতে গেলে, নেপালের ওই পাহাড়ি গ্রাম্য সমাজ ও মানসিকতার মাঝে নিজেকে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে ও জ্ঞানকে বড্ড বেখাপ্পা লাগছিল। এদেশেও যে নিজের সম্বন্ধে কখনো কখনো একই উপলব্ধি হয় সেটাও বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। জানি না এই দুরত্ব কখনো মিটবে কিনা। এটাও জানি না যে তা মেটানোর রাস্তাটাই বা কী—ওদের 'ধারাবাহিক উন্নতি' নাকি আমাদের 'ধারাবাহিক অবনতি'।

টঙ্কারামের সঙ্গে আরও অনেক কথা হয়েছিল। কিছু গোটা গোটা কথা আর কিছু খুচরো কথা। অনেক তথ্যের আদানপ্রদান হয়েছিল। অনেক অনুভূতি আর উপলব্ধির আদানপ্রদানও হয়েছিল। সবটা এই লেখাতে বলতে পারলাম না। সবটাকেই যে ভাষা দিতে পারা যাবে তাও নয়। কিছু অনুভূতি প্রাকভাষা স্তরেই রয়ে গেছে; জানি না আরও কিছুটা বয়স বাড়লে সেগুলো মনের গহনে ভাষার রূপ পাবে কি না। বিদায়বেলায় রুক-স্যাক কাঁধে নিয়ে আমি আর টঙ্কারাম পাহাড় বরাবর প্রায় এক ঘণ্টা নামলাম। পাহাড়ের পাদদেশে এসে সুনকশি নদীটা পেরোলাম একটা কাঠের ব্রিজ দিয়ে। তারপর বাসে করে বনেপা। বনেপাতে নৈশ-বাসে আমায় তুলে দিয়ে টঙ্কারামজি বিদায় নিলেন। তার আগে অবশ্য আমরা বনেপা শহরটা অনেকটাই একসঙ্গে ঘুরলাম।

নৈশ-বাস আমায় পরেরদিন ভোরবেলায় বীরগঞ্জ নামাল। তখনও অন্ধকার। সীমান্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। নেপাল বর্ডারে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করল আর ব্যাগ চেক করল। তবে ভারতের তরফে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হল না। হাঁটতে হাঁটতে রক্সৌল পৌঁছোলাম। সেখান থেকে সকাল১০টায় সেই মিথিলা এক্সপ্রেস ধরেই ছিল ফেরার যাত্রা।

একটা প্রশ্ন অবশ্য ততক্ষণে দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। যে মানুষটা যাত্রা শুরু করেছিল, সেই মানুষটাই কি ফিরছে? যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই বা সে ফিরছে কি? □

ডা. জিৎ সরকার, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

চিকিৎসক

ঘামাচি কমে কীসে?

ঘামাচি—অতিরিক্ত উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে ঘামের গ্রন্থিতে অতিরিক্ত ঘাম জমে, কখনো গ্রন্থির নালী ফেটে গিয়ে ঘামাচির সৃষ্টি হয়। ঘামাচি নিয়ে খুব চালু মিথ হল—''প্রথম বৃষ্টির জলে ভিজলে ঘামাচি সেরে যায়।'' আসলে গরমের কষ্টের পর প্রথম বৃষ্টিতে ভেজার লোভ সামলানো মুশকিল, আর আবহাওয়া একটু শীতল হলে ঘামাচি এমনিতেই কমে যায়। এই বৃষ্টিতে ভেজার 'মিথ' যেমন মিথ্যা তার চেয়েও বেশি মিথ্যা আধুনিক মিথ—''অমুক পাউডার লাগালে ঘামাচি সারে''। আধুনিক মিথ ক্ষতিকারকও বটে, কারণ পাউডার লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দিয়ে ঘাম বেরোনোর পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাতে ঘামাচি আরও বাড়ে।

'ভাতুরি' হলে ভাত বন্ধ!

Molluscum Contagiosum একটি ভাইরাসঘটিত রোগ, সাধারণত শিশুদের ত্বকে ছোটো ছোটো সাদাটে চকচকে শক্ত গুটির আকারে দেখা যায়। ডাক্তারি পরিভাষায় এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। শহুরে লোকেরা একে বলেন—''কী একটা দানা/আঁচিল হয়েছে''। গ্রামের লোকেদের এটা খুব চেনা রোগ—'ভাতুরি'।এই গুটি থেকে সাদা ভাতের মতো একটা জিনিস বেরোয় যা আসলে Molluscum body। ভাতের মতো দেখতে জিনিস থাকে বলে ভাতুরি আর তাই খুব সোজা সমাপতনে 'শিশুর ভাত খাওয়া বন্ধ!' খাওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই—স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় এই রোগ। আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হলে এমনি সেরে যায়, না হলে কিছু চিকিৎসা লাগে।

একজিমা সারালে হাঁপানি?

''একজিমা সারালে হাঁপানি বাড়ে''—এই ধারণার শেকড় ওপড়ানো যে কতটা দুরূহ কাজ তা যেকোনো চিকিৎসকই জানেন। ''একজিমা'' রোগটা সম্পর্কে আলাদা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। শুধু এই লোকধারণা নিয়েই বলি আজ—একজিমা অনেক ধরনের হয়। হাঁপানির সঙ্গে সম্পর্কিত এক ধরনের একজিমা আছে—সেইসব রোগীদের তিনটে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—একজিমা, হঠাৎ হাঁচি ও নাক দিয়ে জলপড়া আর হাঁপানি। এমনিতে জীবনের যেকোনো সময়ে এই তিনটের যেকোনো সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে এই একজিমার (Atopic Dermatitis) উপসর্গ ও লক্ষণ শৈশবেই বেশি দেখা যায়, আর পরবর্তী জীবনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজিমা কমে যায়। শৈশবে এই একজিমা (বা অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস)-এ যারা ভোগে তাদের শতকরা ৩৫ ভাগের ক্ষেত্রে হাঁপানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং শৈশবে একজিমা বড়ো হলে হাঁপানি—এই পর্যবেক্ষণের ফলেই এই ধারণার উদ্ভব। কিন্তু একজিমা সারালে হাঁপানি হবে এই ভয়ে একজিমা নিয়ে কষ্ট সহ্য করার কোনো যুক্তি নেই। বরং একজিমা দেখাতে গিয়ে 'অ্যাটোপিক' বলে ধরা পড়লে ঠিকমতো চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়, ফলে হাঁপানির প্রকোপও কমানো যায়।

‘কেন্ট’-কে সার্টিফিকেট ও আইএমএ-র কাছে ডাক্তারদের কৈফিয়ত দাবি

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) ‘কেন্ট’ জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্রকে ‘কার্যকর’ বলে ভূষিত করেছে, আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে আইএমএ-রই সদস্য কয়েকজন ডাক্তার আইএমএ-র কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা চেয়েছেন। ‘কেন্ট’ অনেক জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে আইএমএ তাদের জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্রকে ‘কার্যকর’ বলে ভূষিত করেছে, ‘অনুমোদন’ করেছে, ‘গ্রহণ’ করেছে—আর এই নিয়েই বিশেষ করে ইন্টারনেটে ডাক্তারদের মধ্যে জোর বিতর্ক বেঁধেছে। কেউ বলছেন আইএমএ কেন্ট-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ঠিক করেছে, কেউ বলছে ভুল করেছে।

আইএমএ সভাপতি ডা. এ মারথান্ডা পিল্লাই-এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে—আইএমএ একটা বিশেষ জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্রকে ‘কার্যকর’ বলে প্রমাণ পেল কীভাবে? চিঠিতে লেখা হয়েছে, আইএমএ-র সঙ্গে কেন্ট-এর ‘মউ’ (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) হওয়াতে পত্রলেখকরা তীব্র আঘাত পেয়েছেন। কেননা এতে ‘‘আমাদের সম্ভ্রান্ত সংগঠনটির অর্থাৎ আইএমএ-র বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকল, এবং সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন তুলছে তাতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত।’’

ডাক্তারদের আলোচনার নানা ফোরামে এবং ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ায় ডাক্তারি পেশার নৈতিকতার স্খলনকে অনেক ডাক্তার নিন্দা করছেন, এবং প্রশ্ন তুলছেন, আইএমএ কেন ‘জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্র কোম্পানির মহিমান্বিত সেলসম্যান’-এর ভূমিকায় ডাক্তারদের নামিয়ে আনছেন। অন্যদিকে, একদল ডাক্তার বলছেন, আইএমএ-র যা সংবিধান আছে তা মেনে এইভাবে আইএমএ তার তহবিল বাড়াতে পারে ও সেই অর্থে নিজের লক্ষ্যপূরণের নানা কাজ করতে পারে, তাতে বেআইনি কিছু নেই।

যেসব ডাক্তার এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন তাঁরা দাবি করেছেন, কেন্ট ও এই জাতীয় নানা কোম্পানির সঙ্গে যে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো সবার সামনে প্রকাশ করতে হবে; কারা সেই সব মউ-তে স্বাক্ষর করেছেন এবং কোম্পানি কত টাকা দিয়েছে সেটা প্রকাশ করতে হবে। কেন্ট-এর সঙ্গে করা মউ-টি সদস্যদের সবার কাছে প্রাপ্য নয়, অথচ আইএমএ তিনটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সঙ্গে আইএমএ-র সদস্যদের গ্রেটার নয়ডা এলাকায় বাড়ি তৈরি করবে বলে মউ স্বাক্ষর করেছে—সেগুলো কিন্তু যেকোনো সদস্য দেখতে পারে। এই মউতে সই করেছেন আইএমএ-র তরফে তার সভাপতি ডা. মারথান্ডা পিল্লাই, ভূতপূর্ব সভাপতি ডা. জিতেন্দ্র বি প্যাটেল, ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ডা. নরেন্দ্র সাইনি, ভূতপূর্ব সভাপতি ডা. বিনয় আগরওয়াল, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ডা. কে কে আগরওয়াল, ও আইএমএ-র প্রধান উপদেষ্টা ডা. এন ভি কামাথ।

চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে ‘জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্র’ তৈরি করে এমন সব কোম্পানির দাম ও মালের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে কিনা, ও বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে চিকিৎসা- বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলনামূলক সমীক্ষা করে কেন্ট-কেই সেরা বলে আইএমএ দ্বারা শংসাপত্র পাবার যোগ্য ভাবা হয়েছে কিনা। ভারতের জনসাধারণের শতকরা ৯০ ভাগের কোনো জল পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্র কেনবার ক্ষমতা নেই, এই কথা উল্লেখ করে চিঠিটিতে জানতে চাওয়া হয়েছে যে তাঁদের জন্য, ও দারিদ্রসীমার নীচে মানুষদের জন্য, আইএমএ কী সমাধান স্থির করেছে।

চিঠিটি প্রশ্ন তুলেছে, ‘‘আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন ‘স্বচ্ছ ও সুস্থ ভারত’ হল কেন্ট-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য, এবং কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য প্রাথমিক নয়?’’ পত্রলেখক চিকিৎসকরা এ প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন, কোন ল্যাবরেটরিতে জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। কতগুলো জলের নমুনা কোন কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছিল, আর সেই সমীক্ষা কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে; এবং এই সমীক্ষা ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ’ (যে সংস্থাটি এই ধরনের সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক নাকি অবৈজ্ঞানিক সেটা স্থির করে) কর্তৃক স্বীকৃত কিনা। অবৈজ্ঞানিক দাবিকে স্বীকৃতি ও প্রচারে সাহায্য চিকিৎসকদের পক্ষে কোড অফ মেডিক্যাল এথিক্স লঙ্ঘন করা।

চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেছেন দিল্লি, পাটনা, বিজয়ওয়াড়া ও আগ্রার বহু

চিকিৎসক। এ ছাড়া আছেন জম্মুর আচার্য শ্রীচন্দ কলেজ অফ মেডিসিন-এর মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডা. এস এস সুদান, 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল এথিক্স'-র প্রকাশক 'ফোরাম অফ মেডিক্যাল এথিক্স সোসাইটি'-র চেয়ারপার্সন ডা. সঞ্জয় নাগরাল, যিনি মুম্বাই-এর যশলোক হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজিস্ট, আইএমএ উত্তরপ্রদেশ শাখার প্রাক্তন উপ-সভাপতি সুধীর ঢাকরে, এবং পাঞ্জাবের আইএমএ-র বেশ কিছু প্রাক্তন কর্মকর্তা, যেমন আইএমএ লুধিয়ানা-র প্রাক্তন সভাপতি আর কে শর্মা, পাতিয়ালা আইএমএ-র সভাপতি ডা. বলবীর সিংহ, মরিন্দা আইএমএ-র সভাপতি ডা. নির্মল কুমার ধীমান, লুধিয়ানা আইএমএ-র প্রাক্তন উপ-সভাপতি ডা. নরজিত কাউর।

আইএমএ-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির নথি অনুযায়ী, বিগত মাসে (এপ্রিল ২০১৫) আইএমএ কেন্ট-এর সঙ্গে একটি 'প্রচার-অভিযান' (campaign)-এর জন্য মউ স্বাক্ষর করে। সমিতির সেই সিদ্ধান্তে স্পনসরশিপ-এর কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল না, কিন্তু লেখা ছিল, ''এই প্রচার-অভিযানে নভেম্বর ২০১৬-তে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য আইএমএ-র শতবর্ষ সম্মেলন উপরোক্ত বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে থাকবে।''

ঘটনাচক্রে, কয়েক বছর আগে আইএমএ ইউরেকা ফোর্বস কোম্পানির জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্র 'অ্যাকোয়াগার্ড'-কে কয়েক কোটি টাকার চুক্তিতে 'কার্যকর' বলে ভূষিত করেছিল।

কেন্ট-এর সঙ্গে করা মউ-টি সদস্যদের সবার কাছে প্রাপ্য নয়। কিন্তু অন্য কিছু মউ এরকম গোপন করে রাখা হয়নি। আইএমএ তিনটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সঙ্গে আইএমএ-র সদস্যদের গ্রেটার নয়ডা এলাকায় বাড়ি তৈরি করবে বলে যে মউ স্বাক্ষর করেছে সেটা ছাড়াও আইএমএ আরও কিছু মউ স্বাক্ষর করেছে। যেমন একটি ডাক্তারি শিক্ষার সফটওয়্যার কোম্পানির সঙ্গে মউ, এবং সেটাকে সমস্ত মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান ও আইএমএ-র শাখাতে এটি 'খতিয়ে দেখে বিবেচনা' করার সুপারিশ আইএমএ করেছে। স্যানিটারি ও সংক্রমণ-প্রতিরোধক প্রস্তুতকারী সংস্থা হাইজিয়া ইন্ডিয়া (রোজারিয়া কসমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড)-এর সঙ্গে আইএমএ একটি মউ স্বাক্ষর করে ও 'আইএমএ হাইজিয়া সেফ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ' গড়ে তোলে।

আইএমএ দাবি করেছে যে কেন্ট-এর সঙ্গে মউ কোনো বিশেষ ব্র্যান্ডকে সুপারিশ করা নয়, বরং একটা সুস্বাস্থ্যের বার্তাকে তুলে ধরা। আইএমএ-র সাধারণ সম্পাদক ডা. আগরওয়াল বলেছেন আইএমএ মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র (এমসিআই) আইনি আওতায় বাইরে, আর কোনো স্বাস্থ্যবার্তার সুপারিশ করে অর্থ নেওয়া এমসিআই-এর নিয়মবিরুদ্ধ নয়। আইএমএ সংগঠন হিসেবে এমসিআই-এর হাতের বাইরে হতে পারে, কিন্তু এর সমস্ত সদস্য হলেন ডাক্তার, এবং নিয়মের দিক থেকে দেখতে গেলে আইএমএ-র সিদ্ধান্তের অংশীদার, আর তাঁরা সবাই এমসিআই-এর নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।

আইএমএ-র কেন্ট সুপারিশ করায় আপত্তি জানিয়েছে পাঞ্জাব মেডিক্যাল কাউন্সিল (এমসিআই-এর পাঞ্জাব রাজ্য শাখা)। পাঞ্জাব মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডা. অরুণ মিত্র ২০০৯ সালে পাঞ্জাব আইএমএ-র বরিষ্ঠ উপসভাপতি ছিলেন; তিনি বর্তমান আইএমএ সভাপতি ডা. মারথান্ডা পিল্লাই ও সম্পাদক ডা. আগরওয়ালাকে লিখেছেন, আইএমএ কোনো কোম্পানির জিনিসকে 'কার্যকর' বলে ভূষিত করতে পারে না। পাঞ্জাব মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি ডা. জি এস গ্রেওয়াল এমসিআই-এর সভাপতি ডা. জয়শ্রী মেহতাকে চিঠি লিখে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন; চিঠিতে বলা হয়েছে, ''এক দল চিকিৎসক, অর্থাৎ আইএমএ-র বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মের তালিকার ৬.১ ধারায় গুরুতর অভিযোগ এনেছেন একজন সহকর্মী। এটা এমসিআই-এর বিশ্বাসযোগ্যতার একটি পরীক্ষা হিসেবে ধরা যায়; বিশেষ করে আইএমএ-র এইরকম কাজের ব্যাপারে কী করা হয় সেটা দেখতে সারা দেশ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।''

এমসিআই সভাপতি জয়শ্রী মেহতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ''আইএমএ কেন্ট জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্রকে কার্যকর ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত করা—এসব নিয়ে অভিযোগ পেয়েছি। সেটা খতিয়ে দেখা আর দরকারি পদক্ষেপ নেবার জন্য এথিক্স কমিটি-র চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়েছি।''

একটামাত্র কোম্পানির দাবি কী করে আইএমএ মেনে নিয়ে ঘোষণা করতে পারে—প্রশ্ন তুলেছেন ডা. গ্রেওয়াল। ''আইএমএ কি কোনো পাবলিক ঘোষণা বা টেন্ডার ডাকা—এইসব করেছিল, যেখানে সব জল-পরিশুদ্ধিকরণ যন্ত্র কোম্পানি তাদের মাল পরীক্ষা করতে দিতে পারে? তাহলে কেবল 'কেন্ট' কোন ভিত্তিতে?''

২০০৮ সালে ট্রপিকানা জুস আর কোয়েকার ওটস—এদের আইএমএ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুপারিশ করে তাই নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিল। এমসিআই-এর এথিক্স কমিটি আইএমএ-র আধিকারিকদের, যারা ডাক্তার, এবং এই সুপারিশদানের সিদ্ধান্তের অংশভাগী, তাঁদের লাইসেন্স সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করেছিল। তাঁরা হাইকোর্টে যান, এবং হাইকোর্টের রায়ে এথিক্স কমিটির সিদ্ধান্ত এই কারণে খারিজ করা হয় যে আইএমএ-র আধিকারিকদের অভিপ্রায় নিয়ে এমসিআই-এর অভিযোগ নেই।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ২৩ মে, ২০১৫ http://timesofindia. indiatimes.com/india/Row-over-IMA-nod-for-water-purifier-hots.up/articleshow/47451403.cms এবং http://timesofindia.indiatimes.com/india/IMA-Kent-endorse-Or-can-it/articleshow 47391869.cms, accessed on 5 June 2015.

চিকিৎসা কথা

কঙ্কাল কাণ্ডের কঙ্কাল

গত ১১জুন ২০১৫, খাস কলকাতার কেন্দ্রে তিন নম্বর রবিনসন স্ট্রিটের ঘটনা সকলকে চমকে দিয়েছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার ছেলে পার্থ দে-র ডাকে প্রথমে সিকিউরিটি পরে পুলিশ যায় 'বডি' উদ্ধার করতে। কিন্তু তাদের কাছে বড়ো চমক অপেক্ষা করছিল। জামাকাপড়-পরা এক মহিলার কঙ্কাল বিছানায় শোয়ানো ছিল। পার্থ দে বলেন ওটি তার দিদি—যিনি নাকি উপোস ও সাধনা করতে করতে ছয় মাস আগে দেহত্যাগ করেছেন। তারও চার বছর আগে তাদের মা মারা যান। বাড়িতে দু-টি পোষা কুকুরের কঙ্কালও পাওয়া যায়। খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। টি ভি-তে মনোবিদরা বসে যান পার্থ দে তথা ওই পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে। পার্থ দে-র ডায়রির কিছু কথা থেকে এরকম ইঙ্গিতও নাকি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে দিদির হয়তো যৌন সম্পর্ক ছিল। রবিনসন স্ট্রিটের বাড়ি দেখতে মানুষের ঢল নামে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পার্থ দে যেখানে আছেন চিকিৎসার জন্য সেই পাভলভ মানসিক হাসপাতালে অতি উৎসাহী কেউ কেউ গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একদিকে রসালো হয়তো কিছুটা গা ঘিনঘিনে সম্পর্কের সুড়সুড়ি অন্যদিকে আত্মা-ভূত-কঙ্কাল মিলে শিহরণ জাগানো ঘটনা। পাবলিক দারুণ খাচ্ছে। আর খবরওয়ালারাও নাওয়া-খাওয়া ভুলে খবর খাওয়াতে নেমে পড়েছে। কিন্তু এই গণ উন্মাদনার আড়াল থেকে কতগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে খেতে উঠে আসছে।

১. আচার-আচরণ কথাবার্তায় বোঝা গেছে পার্থ দে মানসিক রোগী। তার চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। যেকোনো রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে তার রোগের ইতিহাস, তার পরিচয়, তার নিজের বা দায়িত্বশীল অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটা কথা চিরকুটে এবং ডায়রিতে লেখা প্রত্যেকটা শব্দকে যেভাবে মিডিয়াতে বিশ্লেষণ হচ্ছে তা কি সঠিক? এটা কতটা নৈতিক?

২. পুলিশ এখানে অতি সক্রিয়। একজন মানসিক রোগী ঘটনায় জড়িত বলে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে বোধহয়। ওপরওলা বা রাজনৈতিক চাপ নেই—অন্তত এখনও পর্যন্ত। কিন্তু যার চিকিৎসা এখনও শেষ হয়নি, যার চিন্তার জগতের অধিকাংশটাই অবাস্তব—তার প্রত্যেকটা কথাকে গুরুত্ব দিয়ে সে কোনো ক্রাইম করেছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

৩. এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়ার এক গ্রামে একজন লোক ফেরিওলার সঙ্গে বচসাতে জড়িয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মুন্ডু কেটে নিয়ে সেই জঙ্গলে পালিয়েছে। খবরে প্রকাশ তিনিও মানসিক রোগী। কিন্তু এরকম রোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়েও তিনি খবরের শিরোনাম পেলেন না বা বেশিদিন খবরেও থাকতে পারলেন না। কেন? কলকাতার কেন্দ্রস্থলে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত পার্থ দে-র সঙ্গে মুণ্ডু কর্তনকারী লোকটার সামাজিক অবস্থানের কোনো তুলনাই হয় না। সেটাই কারণ কি? পার্থ দে বাংলার থেকে ইংরাজি (রাজভাষা) বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ, হঠাৎ হঠাৎ রবীন্দ্র সংগীত (সংস্কৃতিবান!) গেয়ে ওঠেন, তার কঙ্কাল হয়ে যাওয়া দিদিও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। এই শ্রেণি-অবস্থান কি মানুষ ও মিডিয়ার আকর্ষণের একটা বড়ো কারণ। তাই প্রান্তিক মানুষটি মানসিক রোগী হয়ে মুণ্ডু কেটেও ঠিক খবরে আসতে পারলেন না। খবরে নাম তোলাতেও শ্রেণি-বৈষম্য!

৪. যারা রবিনসন স্ট্রিটের বাড়ির সামনে গিয়ে সেল্ফি তুলছে তাদের কোন মানসিকতা! শুধুই হুজুগ। নাকি অসুস্থ সুস্থর বিভাজনে নিজেদেরকে এভাবে সুস্থ বলে জাহির করছে। আরও ভয়ংকর পাভলভ হাসপাতালে পার্থ দে-কে দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা। সেই লজ্জাজনক অধ্যায় মনে করিয়ে দিচ্ছে না কি যখন পয়সা দিয়ে লোকে 'পাগলা গারদে' মানসিক রোগী দেখতে যেত!

৫. এমনিতে পাভলভে ভর্তি মানসিক রোগীদের ওয়ার্ডগুলোর অবস্থা ভালো নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বেড, জল, খাবার সবই অপ্রতুল। সেখানে পার্থ দে পছন্দের খাবার, টুথপেস্ট পাচ্ছেন, ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে কয়েকজন রোগী বলছেন যদি কঙ্কাল নিয়ে শুয়ে থাকলে এইসব সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়—তারা রাজি! আমাদের প্রশ্ন সব মানসিক রোগী সুস্থ পরিবেশে যাবার সমান সুযোগ পাবে না কেন? একজন পাচ্ছেন কেন—এখানেও কি সামাজিক অবস্থান কাজ করছে?

৬. দে পরিবারের সবাই নাকি উচ্চশিক্ষিত ছিল। ঘরে প্রচুর বই ছিল। যার বেশিরভাগই বাস্তব বহির্ভূত জগৎ সম্পর্কিত। আত্মা-পরাবাস্তবতার কুসংস্কারে জড়িয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিবারটিই মানসিক রোগী হয়ে গেল। এই উচ্চশিক্ষা কতটা প্রয়োজন। যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শৈশব থেকে দিতে পারলে আরও কত পরিবারের এই পরিণতি হতে পারে—সে প্রশ্নও তুলে দিল ঘটনাটা।

৭. মানসিক রোগীর ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা দরকার হয়। কারণ এগুলোর পার্শ্বক্রিয়া। বেশি ঘুমিয়ে পড়া, একটু ঝিমানো—এগুলোকে সাধারণ ডাক্তাররা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। বিশেষ করে ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে। পার্থ দে-র মধ্যে এসব পার্শ্বক্রিয়ার লক্ষণ এখনও পাওয়া যায়নি, মিডিয়ার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অন্তত ধরা পড়েনি। তবে কি এত হইচই-এর মধ্যে এই রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তাররা মুক্ত মনে ওষুধ ব্যবহার করতেও 'চাপে' আছেন!

হরেকরকম

হাই-হিল জুতোর ফ্যাশন ও কান-মলা

মে মাসের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে বিখ্যাত কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মানেই উপরি পাওনা সেলেব-দর্শন ও ফ্যাশন দুনিয়ার ট্রেন্ড-সেটিং। স্কার্টের ঝুল ঠিক কতটা নামবে, কোন গয়না কোনখানে কেমন স্টাইলে বসবে, কোন জুতো কোন জামা ইন-থিং আর কোনগুলো পুরোনো বাতিল, সে সব ঠিক করে দেয় এই ফ্যাশন ইভেন্টগুলো।

এবারে সমস্যা হয়েছে জুতো নিয়ে। ফেস্টিভ্যালের ড্রেস-কোডে নাকি ছিল, লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে হাই-হিল জুতো ছাড়া চলবে না। বলা বাহুল্য এ নিয়ম কেবল মহিলাদের জন্যই প্রযোজ্য। কিছু সেলেব-আধাসেলেব মহিলা সেরকম উঁচু হিল পরে আসেননি। তাঁদের কয়েকজনের বয়স হয়েছিল, আর পেন্সিল-হিল পরে ব্যালান্স রেখে হাঁটা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তার পরে তাঁদের ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হয়। পুরুষদের জুতোর হিল নিয়ে অবশ্য কোনো নিয়ম ছিল না।

স্বাধীনতা, লিঙ্গ-সাম্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা গুণীজনেরা যথাস্থানে করছেন। আমরা কেবল বলব, সাধারণ তথা ফ্ল্যাট-হিল জুতোকে কান-ওয়ালা হাই-ফ্যাশন অচ্ছুৎ করে রাখলেও, এবং এই সব ফ্যাশনের দৌলতে আমাদের মেয়েরা হাই-হিল জুতোকে 'উঁচু' হবার লক্ষণ ভেবে হুমড়ি খেয়ে কিনলেও, কয়েকটা সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে রাখা ভালো।

হাই-হিল জুতো ব্যাপারটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মোটামুটি চার-শো বছরের পুরোনো, এবং এই ফ্যাশন চালু হবার প্রায় প্রথম দিন থেকেই ওখানকার ডাক্তারি মত হাই-হিলের বিরুদ্ধে ছিল এবং এখনও তাই আছে। আশ্চর্য কথা হল, চীনদেশে মেয়েদের পা ছোটো রাখার জন্য ছোটো শক্ত জুতো পরানো নিয়ে যারা নাক সিঁটকাতেন, নিজেদের নাকের সামনে নিজেদের মেয়েদের পা বিকৃত করার এই ব্যবস্থাটাকে সেইসব পাশ্চাত্য ফ্যাশনওয়ালারা সেদিন দেখতেই পেতেন না, এবং আজও পান বলে প্রমাণ মেলে না। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠক দেখতে পারেন http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=lawpubs।

অনেকদিন ধরে উঁচু হিল জুতো যাঁরা পরেন তাঁদের এক-তৃতীয়াংশের দেহে নানারকম স্থায়ী ক্ষতি হয়। প্রকৃতি আমাদের শরীরকে খালি পায়ে নরম মাটিতে হাঁটা বা দৌড়ানোর জন্য তৈরি করেছে। খালিপায়ে হাঁটলে বা সাধারণ 'ফ্ল্যাট' হিল জুতো পরলে, পায়ের পাতার ওপর শরীরের ওজন সমভাবে ভাগ হয়ে পড়ে। উঁচু হিল জুতো পরলে শরীরের ওজনের অধিকাংশটাই পড়ে পায়ের সামনের দিকে, আঙুলের ঠিক পেছনের চওড়া ফোলা অংশটায়; এটাকে ইংরাজিতে বলে 'বল অফ দ্য ফুট' (ball of the foot)। জুতোর হিল যত উঁচু হবে 'বল অফ দ্য ফুট'-কে তত বেশি চাপ বহন করতে হবে, কিন্তু এই অংশটার তো এই চাপ নেবার উপযুক্ত গঠন নেই; সুতরাং সমস্যা। পায়ে ব্যথা, পায়ের আঙুল বেঁকে যাওয়া (হ্যামার টো), বুনিয়ন, পায়ের পেছনের অ্যাকিলিস টেন্ডনের স্থায়ী বিকৃতি।

কিন্তু সমস্যা কেবল পায়েই থেমে থাকে না। পেছনের দিকে উঁচু হিল থাকায় শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে যায়, আর সে শরীরকে খাড়া রাখতে গেলে পায়ের পেছনে অ্যাকিলিস টেন্ডনের ঠিক ওপরে থাকা কাফ মাসলকে সবসময় সংকুচিত অবস্থায় থাকতে হয়; সেখানে ব্যথা হয়, আর তারপর কাফ মাসল স্থায়ীভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। সামনে ঝোঁকা শরীরকে খাড়া রাখবার দায় পড়ে হাঁটুর ওপরে, আর হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে বারবার চাপ পড়তে পড়তে একসময় হাঁটুর আর্থ্রাইটিস হয়।

একটা বাড়ির ভার বহন করে তার থাম বা পিলারগুলো। তেমন করেই পায়ের হাড়, তার ওপরে নিতম্বের কয়েকটি হাড়ের মিলিত গঠন, আর তার ওপরে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে আমাদের শরীরের ভার বহন করা হয়। বাড়ির পিলারগুলো সোজা হয়, বেঁকে গেলেই বিপদ। কিন্তু খালি পায়ে (বা ফ্ল্যাট-হিল জুতো পরে) খাড়া হয়ে দাঁড়ালে, এই ভারবহন রেখাটি একটা সুনির্দিষ্ট বাঁকা রেখা হয়। সোজা রেখা হয় না তার কারণ হল, আমাদের দেহের কাজ বাড়ির মতো সদা-সর্বদা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়, চলাফেরা করা; আর তার জন্য আমাদের দেহের 'পিলারগুলোর' এই নির্দিষ্টভাবে বাঁকা গঠনটা খুব প্রয়োজন। থামের মতো সোজা রেখা হলে চলবে না, আবার অন্য রকমভাবে বাঁকা রেখা হলে চলবে না। পা, নিতম্ব ও মেরুদণ্ড—এদের মধ্যে যে ভারবহনকারী রেখাটি চলে, তার বক্রতা যেমন আছে তেমনি না থাকলেই মুশকিল। হাই-হিল ঠিক সেই মুশকিলটাই ডেকে আনে।

বোরখা, সিঁদুর, টিপ—এগুলোর অসুবিধা নিয়ে আমরা যেমন ভাবি, হাই-হিল নিয়ে তেমন জোর দিয়ে ভাবতে পারি কি? সন্দেহ হয়। বোরখা, সিঁদুর, টিপ নিয়ে সাহেবরা সাধারণভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন বলে আমাদের মনের গভীরে সেসব নিয়ে একটা সন্দেহ আছে, যদিও ধর্ম ও লোকলজ্জায় সেগুলো চট করে ছাড়তে পারি না। কিন্তু হাই-হিল? ওরে বাবা, সেটা যে সাহেবদের হাই-ফ্যাশন!

চিত্র ৫৫পাতায়।

টিপ, সিঁদুর, সিঁদুরটিপ

টিপ পরলে খুব সুন্দর দেখায়? না, সে নিয়ে তক্‌কো তোলার কোনো ইচ্ছে বা রুচি আমাদের নেই। খালি একবার দেখে নেবার চেষ্টা করব, টিপ সবার সহ্য হয় কিনা, আর না হলে কী করা যায়।

টিপ অনেকরকম হয়। তবে আমাদের দেশে মহিলারা সাধারণত দু-ধরনের টিপ পরেন, এক হল সিঁদুরের টিপ, আর অন্যটা আঠা দেওয়া টিপ। সিঁদুরের টিপ হিন্দু মহিলা ছাড়া অন্যরা তেমন পরেন না, সিঁদুরের কথা বলার সময় সেটা নিয়ে দু-চার কথা বলা যাবে। আঠা দেওয়া টিপ কিন্তু নানা রঙের হয়, আর বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধর্মের সব মেয়েরাই সেটা পরেন।

এই ধরনের টিপে চামড়া সাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা খুব বেশি ঘটে। ঠিক টিপের জায়গায় চামড়া সাদা হয়ে যায়, দেখে মনে হয় শ্বেতি হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় অবশ্য এটাকে শ্বেতি বলা হয় না; এর নাম দেওয়া

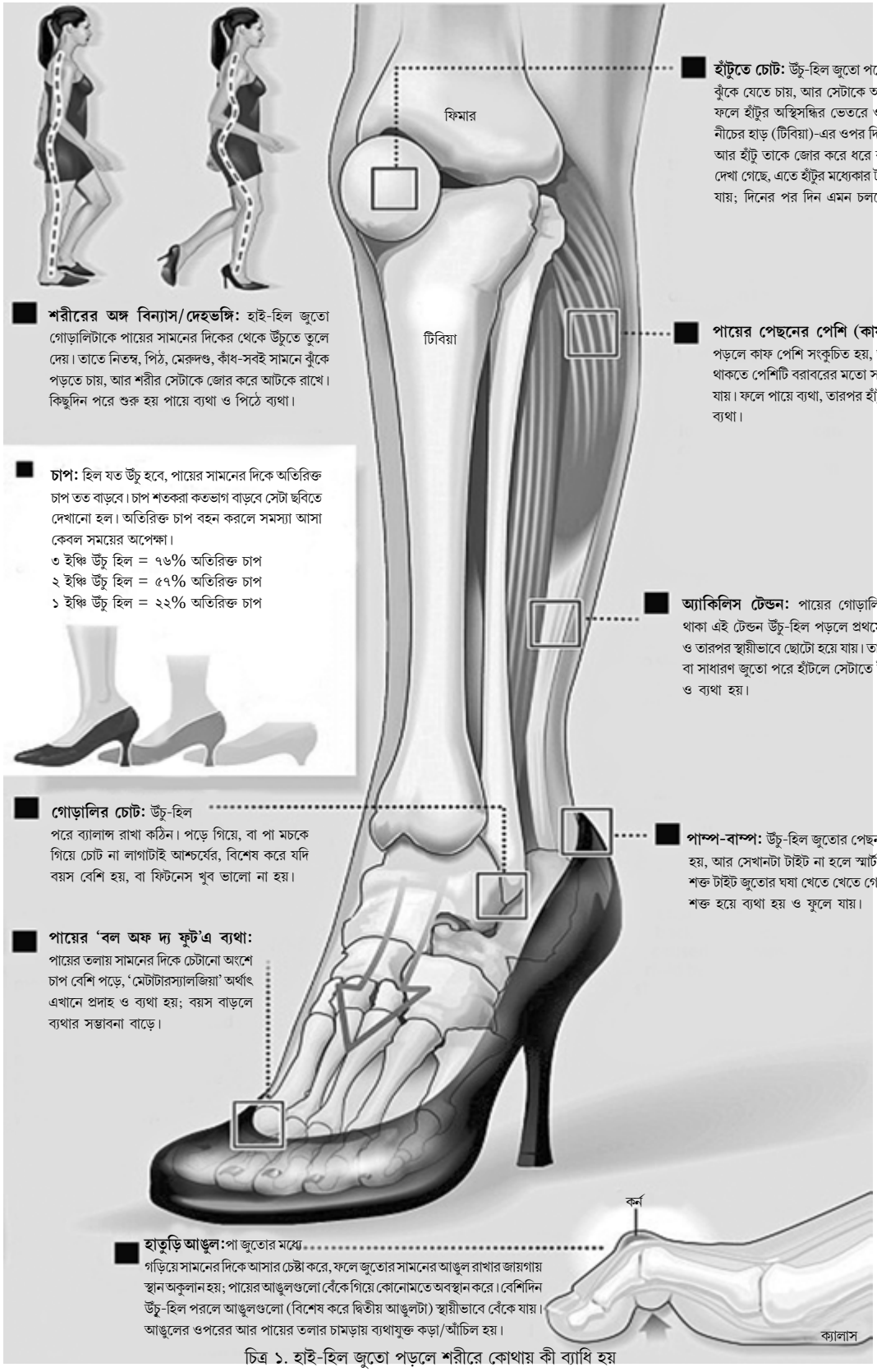

হাঁটুতে চোট: উঁচু-হিল জুতো পরে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে যেতে চায়, আর সেটাকে অনেকটা সামলায় হাঁটু। ফলে হাঁটুর অস্থিসন্ধির ভেতরে ওপরের হাড় (ফিমার) নীচের হাড় (টিবিয়া)-এর ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে চায়, আর হাঁটু তাকে জোর করে ধরে রাখে। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, এতে হাঁটুর মধ্যেকার টান ২৬% মতো বেড়ে যায়; দিনের পর দিন এমন চললে ফল আর্থ্রাইটিস।

শরীরের অঙ্গ বিন্যাস/দেহভঙ্গি: হাই-হিল জুতো গোড়ালিটাকে পায়ের সামনের দিকের থেকে উঁচুতে তুলে দেয়। তাতে নিতম্ব, পিঠ, মেরুদণ্ড, কাঁধ-সবই সামনে ঝুঁকে পড়তে চায়, আর শরীর সেটাকে জোর করে আটকে রাখে। কিছুদিন পরে শুরু হয় পায়ে ব্যথা ও পিঠে ব্যথা।

পায়ের পেছনের পেশি (কাফ মাসল): উঁচু-হিল পড়লে কাফ পেশি সংকুচিত হয়, আর সংকুচিত থাকতে থাকতে পেশিটি বরাবরের মতো সংকুচিত ও ছোটো হয়ে যায়। ফলে পায়ে ব্যথা, তারপর হাঁটু, নিতম্ব ও শিরদাঁড়ায় ব্যথা।

চাপ: হিল যত উঁচু হবে, পায়ের সামনের দিকে অতিরিক্ত চাপ তত বাড়বে। চাপ শতকরা কতভাগ বাড়বে সেটা ছবিতে দেখানো হল। অতিরিক্ত চাপ বহন করলে সমস্যা আসা কেবল সময়ের অপেক্ষা।

৩ ইঞ্চি উঁচু হিল = ৭৬% অতিরিক্ত চাপ
২ ইঞ্চি উঁচু হিল = ৫৭% অতিরিক্ত চাপ
১ ইঞ্চি উঁচু হিল = ২২% অতিরিক্ত চাপ

অ্যাকিলিস টেন্ডন: পায়ের গোড়ালির ঠিক ওপরে থাকা এই টেন্ডন উঁচু-হিল পড়লে প্রথমে সাময়িকভাবে ও তারপর স্থায়ীভাবে ছোটো হয়ে যায়। তারপর খালিপায়ে বা সাধারণ জুতো পরে হাঁটলে সেটাতে টান ধরে, প্রদাহ ও ব্যথা হয়।

গোড়ালির চোট: উঁচু-হিল পরে ব্যালান্স রাখা কঠিন। পড়ে গিয়ে, বা পা মচকে গিয়ে চোট না লাগাটাই আশ্চর্যের, বিশেষ করে যদি বয়স বেশি হয়, বা ফিটনেস খুব ভালো না হয়।

পাম্প-বাম্প: উঁচু-হিল জুতোর পেছনদিকটা প্রায়ই খুব শক্ত হয়, আর সেখানটা টাইট না হলে স্মার্টলি হাঁটা যায় না। সেই শক্ত টাইট জুতোর ঘষা খেতে খেতে গোড়ালির পেছনে হাড়টা শক্ত হয়ে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়।

পায়ের 'বল অফ দ্য ফুট'এ ব্যথা: পায়ের তলায় সামনের দিকে চেটানো অংশে চাপ বেশি পড়ে, 'মেটাটারস্যালজিয়া' অর্থাৎ এখানে প্রদাহ ও ব্যথা হয়; বয়স বাড়লে ব্যথার সম্ভাবনা বাড়ে।

হাতুড়ি আঙুল: পা জুতোর মধ্যে গড়িয়ে সামনের দিকে আসার চেষ্টা করে, ফলে জুতোর সামনের আঙুল রাখার জায়গায় স্থান অকুলান হয়; পায়ের আঙুলগুলো বেঁকে গিয়ে কোনোমতে অবস্থান করে। বেশিদিন উঁচু-হিল পরলে আঙুলগুলো (বিশেষ করে দ্বিতীয় আঙুলটা) স্থায়ীভাবে বেঁকে যায়। আঙুলের ওপরের আর পায়ের তলার চামড়ায় ব্যথাযুক্ত কড়া/আঁচিল হয়।

চিত্র ১. হাই-হিল জুতো পড়লে শরীরে কোথায় কী ব্যাধি হয়

চিত্র: ১. আঠাযুক্ত টিপ থেকে সাদা দাগ

হয়েছে 'কেমিক্যাল লিউকোডার্মা'। 'একেবারে সাদা-চামড়া' কথাটার প্রতিশব্দ হল 'লিউকোডার্মা,' আর টিপের রাসায়নিক দ্রব্য বা কেমিক্যাল থেকে চামড়া সাদা হয়ে যায় বলে 'কেমিক্যাল লিউকোর্ডামা'। তা কোন কেমিক্যাল থেকে চামড়া সাদা হয়ে যায়? টিপের আঠায় থাকে *p*-tertiary butylphenol। এই রাসায়নিকটি আমাদের চামড়ার কালো রঞ্জক (মেলানিন) তৈরি করে যেসব কোষ তাদের মেরে ফেলে। ফলে ওখানে মেলানিন তৈরি হয় না, চামড়া একেবারে ফটফটে সাদা দেখায়।

এ ছাড়াও টিপের নানা রাসায়নিক পদার্থ থেকে আমাদের চামড়ায় 'স্পর্শজনিত একজিমা' হতে পারে। তাতে চামড়া প্রথমে লালচে হয়ে যায় ও চুলকায়; পরের দিকে চামড়া কালো ও মোটা হয়ে যায়, চুলকানি কিছুটা কমতে পারে, কিন্তু একেবারে যায় না।

একবার আঠাযুক্ত টিপ থেকে সাদা দাগ হলে সেটাকে সারানো শক্ত; কিন্তু সারানোর প্রাথমিক শর্ত হল ওই টিপটা সারাজীবনের মতো বাদ দিতে হবে। আর টিপ থেকে স্পর্শজনিত একজিমা হলে সেটা সারানো তুলনায় সোজা, কিন্তু সেখানেও আঠা-টিপ বাতিল করতে হবে।

আঠাযুক্ত টিপ বাতিল করে অন্য টিপ ব্যবহার করতে গেলেও কয়েকটা দিক ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, যতদিন সাদা দাগ বা স্পর্শজনিত একজিমা পুরো না সারছে, ততদিন সেখানে অন্য কোনো টিপ না লাগানোই ভালো, নইলে রোগ সারতে দেরি হয়, এমনকী আদৌ না সারতে পারে। আর, অন্য টিপ থেকেও স্পর্শজনিত একজিমা বেশ সাধারণ ঘটনা, যদিও সাদা দাগ তত বেশি হয় না।

সিঁদুর, সিঁদুরটিপ

এবার সিঁদুরের টিপ নিয়ে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে কথা বলার একটা বড়ো সমস্যা হল, সিঁদুর বলে আমাদের এখানে যে জিনিসটা ব্যবহার হয়, অন্য রাজ্যে কুমকুম নামে চলা জিনিসের সঙ্গে সেটা এক নয়; কিন্তু দু-টোরই ধর্মীয় সংস্কারগত স্থান প্রায় এক।

বাংলায় চালু গুঁড়ো সিঁদুর জিনিসটা বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি করে। লাল গুঁড়ো সিঁদুরের উপকরণ হতে পারে পারদঘটিত ও সিসাঘটিত যৌগ, যারা এমনিতেই বিষাক্ত। এ ছাড়া গুঁড়ো সিঁদুর ও বাণিজ্যিকভাবে প্রাপ্ত কুমকুম, এ দুয়েই থাকতে পারে ব্রিলিয়ান্ট লেক রেড আর, সুদান আই, অ্যামাইনোবেনজোন, ট্রাগাকান্থ গাম, থায়োমারসাল, গ্যালেট মিক্স, প্যারাফেনিলিন ডাইঅ্যামিন, ক্যানথন সিজি, বেনজোট্রায়াজোল, টার-বিউটিনারি হাইড্রোকুইনোন, প্যারাবেন, নানা অ্যাজো রং ও অন্যান্য রং (যেমন কোলটার থেকে পাওয়া রং), টলুইডিন রেড, এরিথ্রোসিন, ইত্যাদি। এইসব রাসায়নিকগুলোর প্রত্যেকটিই চামড়ায় স্পর্শজনিত একজিমা করতে পারে, এবং টার-বিউটিনারি হাইড্রোকুইনোন জাতীয় কয়েকটি চামড়ায় সাদা দাগ করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, সিঁথিতে পরুন আর টিপ হিসেবে কপালে পরুন, সিঁদুর পরার সমস্যা খুব কম নয়। আর স্বাস্থ্যের দিক থেকে অন্তত এর কোনো উপকারিতা আছে বলে জানা যায়নি।

এতগুলো রাসায়নিক উপাদান শুনে অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, আজকাল যে হার্বাল সিঁদুর বেরিয়েছে, সেগুলো পরলেই তো হয়। সত্যি কথা বলতে কি, দক্ষিণ ভারতে যে কুমকুম ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশই সহজ পদ্ধতিতে বাড়িতে তৈরি—হলুদের সঙ্গে অল্প একটু চুন মিশিয়ে কুমকুম তৈরি করা হয়। এতে সাদা দাগ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, আর স্পর্শজনিত একজিমার সম্ভাবনা অনেকটাই কম। আর আমাদের বঙ্গদেশে ব্যবহৃত সিঁদুরেও ব্র্যান্ডভেদে কিছু কিছু হার্বাল বা দেশজ উপাদান থাকে, যেমন হলুদগুঁড়ো, নারকেল তেল, নানা ভেষজ গন্ধদ্রব্য। এগুলোতে সাদা দাগ হবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু স্পর্শজনিত একজিমার সম্ভাবনা নিয়ে তেমন সমীক্ষা নেই; জোর দিয়ে বলা মুশকিল এরা ঠিক কতটা নিরাপদ। তাই সিঁদুর থেকে সাদা দাগ বা স্পর্শজনিত একজিমা হলে সবরকম সিঁদুরই এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ।

বাচ্চার কোমরে ঘুনসি

শিশুর কোমরে কালো/লাল সুতোয় তামার ফুটো পয়সা, মাদুলি, ধাতু বাঁধানো গাছের বীজ (ভেলা, রুদ্রাক্ষ) বেঁধে রাখলে রোগবালাই দূরে থাকে।

এই কোমরে ঘুনসি বাঁধার ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো অন্ধবিশ্বাস থেকে। কিন্তু দু-টি কাজে লাগত। এক, কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই শিশুর বৃদ্ধির পরিমাপ করা যেত এই সুতো টাইট হয়ে ঠেলে বসা অথবা ঢিলা হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। দুই, গ্রামেগঞ্জে দেখেছি শিশুর পেট ফাঁপা (abdominal distension) নির্ণয় করা হয় ওই হঠাৎ টাইট হয়ে যাওয়া দেখে।

মাদুলিসহ এই সুতো বা তাগা শিশুর কোমল চামড়ার জন্য বেশ কয়েকটা কারণে ক্ষতিকারক। প্রথমত—স্নানের সময় তেলজল সুতোব. ভেতর বেশ পাকাপোক্তভাবে ঢুকে যায় তা শুকোনোর অবকাশ পায় না, ফলে ওই জায়গায় অনেকসময় ছত্রাক সংক্রমণ হয়।

দ্বিতীয়ত—আমাদের দেশে ''খোস'' খুব বেশি দেখা যায়— চিকিৎসার ফলে শরীরের অন্য জায়গা থেকে খোসের জীবাণু চলে গেলেও ওই অঞ্চলে সুতোর নীচে বাসা বেঁধে থাকে এবং খোস সারতে বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত—ধাতুর মাদুলি থেকে (বিশেষ করে তামা, লোহা, মিশ্র ধাতু) স্পর্শজনিত প্রদাহ (contact dermatitis) প্রায়ই দেখা যায়। ভেলা গাছের (Anacardium) পাতার রস সবকিছু থেকেই ভয়ংকর স্পর্শজনিত প্রদাহ হয়—এটা গ্রামের লোক সবাই জানেন, তবু এর বীজ বাঁধিয়ে ঘুনসিতে বাঁধা থাকে প্রায় সবশিশুরই কেন কে জানে? এক ''ভয়ংকর''কে ধারণ করলে তার ভয়ে অন্যসব ভয়ানক রোগ পালাবে, সেই চিন্তা কাজ করতে পারে।